কালের জয়ডঙ্কা বাজে

কালের জয়ডঙ্কা বাজে

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

কয়েকটি কথা

এ উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার বহুকালের। কিন্তু সময় ও সুযোগ, এ দুয়েরই ছিল চূড়ান্ত অভাব। শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হল কিশোর ভারতীয় তাড়নায়। শারদীয়া কিশোর ভারতীতে আমায় উপন্যাস লিখতে হবে, এই প্রয়োজনের তাগিদেই রচিত হয়েছিল এই উপন্যাস।

কিন্তু শারদীয়া সংখ্যায় স্বভাবতই ছিল স্থানাভাব, তেমনি আমারও ছিল সময়াভাব। তাই 'কালের জয়ডঙ্কা বাজে' সেখানে বেরিয়েছিল সংক্ষিপ্ত আকারে। এবং বেরিয়েই তা নানা স্তরের পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে যে সমাদর ও প্রশংসা পেয়েছিল, তাকে এক কথায় বলা যায়, আমার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি। নিজের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে পাঠক-পাঠিকার এই মতামতকেই আমি সর্বোপরি স্থান দিই।

'কালের জয়ডঙ্কা বাজে' বই আকারে প্রকাশ করার দাবি বহুজনার। সে দাবি পূরণে বেশ একটু বিলম্ব হল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বোধ করি অহেতুক নয়। এখানেও সেই পুরোনো অজুহাত—সময়াভাব। না, শুধু সময়াভাব না বলে তাকে বোধহয় একটু বিশেষিতও করা যায়—প্রচণ্ড সময়াভাব। দ্বিতীয় কারণ বই আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি। তাকে পূর্বেকার সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশ করলে বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার করা হতো না বলেই আমার বিশ্বাস। অতএব, এই সংক্ষেপ করতে গিয়ে যে সব বিষয় তখন বাদ দিতে হয়েছিল এবং অতি দ্রুততার মধ্যে লিখতে গিয়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল, দেরিতে হলেও তার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়ার পরই 'কালের জয়ডঙ্কা বাজে' বই আকারে প্রকাশিত হল।

'কালের জয়ডঙ্কা বাজে' পুরোপুরি ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস। এ জাতীয় কথাসাহিত্য শুধুই ইতিহাস নয় এবং ইতিহাসের দাবির কাছে তার নতিস্বীকারও প্রশ্নাতীত, একথা যেমন সত্য, তেমনি সাহিত্যের নাম করে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোও অনুচিত বলে আমার ধারণা। এই উপন্যাস রচনাকালে আমি অন্তত সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে তথাকথিত কোনও দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা লাভ করিনি।

উপন্যাসের প্রধান সব চরিত্র ও মূল ঘটনাপ্রবাহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সাহিত্যের প্রয়োজনে আরও বহু বিষয়, মালমশলা ও ছোটখাটো চরিত্র আমদানি করতে হয়েছে বটে, কিন্তু তা সে যুগকে বা সে যুগের ইতিহাসকে অস্বীকার করে নয়। সে যুগে যা ছিল বাস্তব বা সে যুগের পরিবেশে যা ঘটা সম্ভব, অন্তত পুঁথিপত্র ঘেঁটে আমি যেটুকু বুঝেছি, তার বাইরে যাইনি। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি সেকালের সেই বর্ণাঢ্য পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে। যতটুকু সমর্থ হয়েছি, আমার ক্ষমতার দৌড় ততটুকুই।

সেকালের অন্যতম বিচিত্র সুন্দর পুরুষ জীবক—মর্তের ধন্বন্তরি আখ্যা যিনি পেয়েছিলেন শেষপর্যন্ত। রাজাধিরাজ হওয়ার সমস্ত গুণ ও যোগ্যতা বর্তমান ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু হেলায় তিনি ত্যাগ করেছিলেন সে পথ! এমন নির্লোভ যুক্তিবাদী ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পুরুষ সেকালের ইতিহাসের পাতায় কমই মিলবে।

জীবক সম্পর্কে সচরাচর যেটুকু জানা যায়,তা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই দীর্ঘকাল যাবৎ নানা ইতিহাস, বৌদ্ধগ্রন্থ, পুঁথিপত্র ঘেঁটে তাঁর জীবনের নানা তথ্য আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এ কাজে অন্য দু-একজনের কাছ থেকে, স্বল্প হলেও, সাহায্য পেয়েছি কিছু-কিছু। তাঁদের কাছে যেমন আমি কৃতজ্ঞ তেমনি ঋণী সেইসব গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের কাছেও, যেখান থেকে জোগাড় করেছি এইসব মালমশলা।

পরিশেষে বলি, শারদীয়া কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত হলেও, এ উপন্যাস শুধু কিশোর তরুণদের জন্যই নয়—কিশোর তরুণ যুবা প্রবীণ সব বয়েসের সবারই জন্য।

প্রথম অধ্যায়

॥ এক ॥

রাজগৃহ নগরী—ধনেজনে উচ্ছল, পঞ্চ পর্বতে ঘেরা সুষমামণ্ডিত মগধের রাজধানী।

সুউচ্চ মজবুত প্রাকারবেষ্টিত মহানগরীতে ঢোকার চারদিকে চারটি সিংহদ্বার—পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে।

চার সিংহদ্বার থেকে প্রধান চারটি প্রশস্ত রাজপথ নগরীর মাঝখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও নগরীর ভেতরে বিভিন্ন দিকে গেছে আরও নানা সরণি।

পথের দুধারে ছায়াঘন দেবদারু ও অন্যান্য মনোরম তরুবীথি, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মন্দির ও সুদৃশ্য নানা অট্টালিকা—কোনওটা ইট বা পাথরের তৈরি, কোনওটা বা কাঠের।

রাজপথ চারটি নগর মধ্যে যেখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে, সে স্থানটি বিস্তীর্ণ সুপ্রশস্ত—উন্মুক্ত ও চতুষ্কোণ। তার মাঝখানে মনোহর ফোয়ারা। উত্তর পাশে নয়নাভিরাম সুউচ্চ বিশাল দেবমন্দির, অন্য সব দিকে অভিজাতবংশীয় নাগরিকদের সুরম্য সৌধ অট্টালিকা, পুষ্পোদ্যান, পদ্মসরোবর, পুষ্পরিণী, তরুবীথি ও পুষ্পকুঞ্জ।

অদূরে বর্ণাঢ্য সুবিশাল রাজপ্রাসাদ। স্ফটিক, গজদন্ত ও মণিরত্নখচিত কারুকার্যময় রাজপুরীর শোভা অতুলনীয়।

নগরীতে চলেছে বৎসরের সেরা উৎসব—কার্তিকোৎসব। আরম্ভ হয়েছে গত কার্তিকী পূর্ণিমায়। আজ পঞ্চম দিবস। চলবে আরও দু-দিন। শুধু রাজপথ নয়, প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সরণিই উৎসবের সাজে সুশোভিত। কিছুদূর পর-পর বিচিত্র সুন্দর সব তোরণ—তৈরি হয়েছে নানা বর্ণের পত্রপুষ্প এবং সূতী ও রেশমি বস্ত্র দিয়ে।

রাজপ্রসাদ থেকে দূরে দক্ষিণে পাঁচিলঘেরা এক প্রশস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ।

রাজপরিবারের ও অভিজাতবংশীয় কিশোরদের মধ্যে অস্ত্রচালনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে। দু-দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা আজ শুরু হয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রের চারদিকে চারটি দরজা। প্রাঙ্গণের এক দিকে গণ্যমান্য দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা। পৃথক-পৃথক ব্যবস্থা নারী ও পুরুষদের। সেখানে তিলধারণের স্থান নেই।

মগধের অধিপতি মহারাজ বিম্বিসার এসেছেন। ভারত ইতিহাসের যুগ-সন্ধিক্ষণে অন্যতম সেই মহাশক্তিধর পুরুষ শালপ্রাংশু মহীরুহের মতো বসে আছেন নিজের আসনে। শৌর্যবীর্যশালী শ্রীমণ্ডিত দেহে প্রবীণ বয়সের কণামাত্র ছাপ নেই কোথাও।

রাজকুমারগণও উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে রাজকুমার অভয় অন্যতম। সুপুরুষ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ—যৌবনদৃপ্ত বীরোচিত চেহারায় সবার দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেন অতি সহজেই।

রাজ্যের মহামাত্য এবং মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য অমাত্যবর্গ ও বিশিষ্ট রাজপুরুষগণও বসে আছেন আপন-আপন আসনে। তা ছাড়া বিশিষ্ট নাগরিকগণও প্রায় সবাই উপস্থিত।

শস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যার্জনের শেষ পর্যায়ে কিশোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, বর্তমান প্রতিযোগিতা তারই অবিচ্ছেদ্য বিশিষ্ট অঙ্গ। তাই পরীক্ষার্থীদের জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এর ফলাফলের দ্বারা।

সবারই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাজকুমার অভয়ের পুত্র জীবকের ওপর। অন্যান্য পরীক্ষায়ও যা, এখানেও তাই চলেছে। জীবকের কাছে এ যেন প্রতিযোগিতাই নয়—অসম একতরফা এক অনুষ্ঠানমাত্র।

ধনুর্বিদ্যা, অসিচালনা, মল্লযুদ্ধ, শক্তিনিক্ষেপ, বর্শাচালনা ও গদাযুদ্ধে জীবক তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনায়াসে হারিয়ে দিচ্ছে একের পর এক।

উজ্জ্বল চোখে রাজকুমার অভয় তাকিয়ে আছেন পুত্রের দিকে।

মহারাজ বিম্বিসারের চোখেও গভীর সস্নেহ দৃষ্টি। সুঠাম দীর্ঘকায় রূপবান বলিষ্ঠ কিশোর তাঁকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। পরনে তার যোদ্ধার বেশ—স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত মহার্ঘ পোশাকের ওপর বর্ম আঁটা, কানে কুণ্ডল, হাতে কঙ্কণ, গলায় কণ্ঠহার, মণিবন্ধে অলঙ্কার, হাতের আঙুলে অঙ্গুরীয়ক আর পায়ে কারুকাজকরা সুদৃশ্য পাদুকা। কোমরে বহুমূল্য কটিবেষ্টনী থেকে কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলছে।

বিম্বিসার বুঝি চোখ ফেরাতে পারেন না। নিজের অতীত কৈশোর যেন তার সামনে দাঁড়িয়েছে জীবকের রূপ ধরে।

ধীরে-ধীরে সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ে। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে। আজকের মতো প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে আসছে।

অপরাহ্নের ছায়া পড়ে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে। হঠাৎ তূর্য বেজে উঠল। কুমারদের প্রধান শস্ত্রশিক্ষক প্রবীণ আচার্য ধর্মধ্বজ এগিয়ে এসে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন সেদিনের মতো। আগামীকাল প্রাতে আবার যথাসময়ে শুরু হবে প্রতিযোগিতা।

॥ দুই ॥

রাজগৃহে যখন অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সেদিনের মতো শেষ হতে চলেছে, তখন—

অপরাহ্ন বেলা।

সশস্ত্র এক তরুণ অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। গায়ে তার বর্ম আঁটা, মাথায় শিরস্ত্রাণ, পিঠে কাঁধের সঙ্গে বাঁধা তীরপূর্ণ তূণীর ও শরাসন, কোমরে তরবারি। ঘোড়ার পাশে জিনের সঙ্গে আটকানো দীর্ঘ বর্শা।

অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় বর্শাফলক জ্বলছে অগ্নিশিখার মতো।

প্রান্তরের ওপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটছে। পেছনে উড়ছে ধুলোর মেঘ।

ক্লান্ত ঘোড়া। ঘর্মাক্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে।

ক্লান্ত অশ্বারোহী নিজেও। সেই কোন ভোরে আলো ফুটবার আগেই রওনা হয়েছে, একটানা ছুটছে—বিশ্রামের অবসর মেলেনি। ইতিমধ্যে দুবার ঘোড়া পাল্টাতে হয়েছে, এটি তার তৃতীয় বাহন।

লক্ষ্য তার রাজগৃহ। প্রত্যন্ত প্রদেশপাল বা অন্তপালের কাছ থেকে সে আসছে। সেখানে পূর্ব সীমান্তে সাংঘাতিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। কাল বিলম্ব না করে সে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। তাই মগধরাজের কাছে অবিলম্বে পৌঁছে দিতে হবে সেই গুরুতর জরুরি বার্তা।

তাই তাকে থামলে চলবে না।

তাছাড়া সন্ধ্যার মধ্যে তাকে যে-কোনওভাবে নগরীর প্রাকারতোরণে পৌঁছতে হবেই, নয়তো এই কার্তিক মাসের ঠান্ডায় নগর-প্রাকারের বাইরে নিরাশ্রয় অভুক্ত অবস্থায় কাটাতে হবে সারারাত। কারণ সন্ধ্যার পর নির্দিষ্টক্ষণে নগরের চারদিকের চারটি সিংহদ্বারই বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন প্রত্যুষে নির্দিষ্ট সময়ের আগে তা খোলা নিষেধ। এমনকী স্বয়ং মহারাজের ক্ষেত্রেও এ

বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা চলে না, আর সে তো কোন ছার—প্রত্যন্ত প্রদেশের এক সৈনিক মাত্র!

পশ্চিম দিগন্তে আবীরের রং একটু-একটু করে গাঢ়তর হয়। কুলায় ফিরছে পাখির ঝাঁক।

নির্জন প্রান্তরের ওপর দিয়ে দু-চোখ কুঞ্চিত করে অশ্বারোহী তাকায় পশ্চিম দিগন্ত পানে। কোথায় কত দূরে পঞ্চ পর্বতে ঘেরা মগধরাজধানী রাজগৃহ?...

ঘোড়া ছুটে চলে বিদ্যুৎ গতিতে...

ধীরে-ধীরে দূরে—বহু দূরে পশ্চিম আকাশের গায়ে মেঘের মতো জেগে ওঠে গিরিতরঙ্গের আভাস।

নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তরুণ সৈনিকের চোখমুখ। জোরে সে কশাঘাত করে অশ্বপৃষ্ঠে।

সূর্যদেব পাটে নামছে ধীরে-ধীরে...

রাজগৃহের গিরিশীর্ষ স্পষ্টতর হয়ে ক্রমেই...

ঘোড়া ছুটছে তীরের মতো—

গোধূলি আলোয় ধীরে-ধীরে স্পষ্টতর হয় সুউচ্চ নগরপ্রাকার...

সৈনিক ঘোড়ায় চাবুক মারে আরও জোরে। খোলা আছে—সিংহাদ্বার খোলা আছে এখনো! তোরণের ভেতর দিয়ে দীপমালাশোভিত নগরীর আভাস চোখে পড়ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় একটু-একটু করে।

অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে জমাটবাঁধা আবছা ছায়ামূর্তির মতো ঘোড়সওয়ার ছুটে চলে তোরণ লক্ষ করে...

রাজধানীতে কার্তিকোৎসব চলেছে, সে জানে। আনন্দোৎসবে মত্ত নাগরিকদের কলকোলাহল কানে আসছে। কানে আসে ভেরিবাদন ও তূর্যনাদ আর মন্দিরে-মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি। সবকিছু মিলে উদ্বেলিত জনসমুদ্রের এক সুগম্ভীর ঐকতান যেন।

ক্লান্ত সৈনিকের চোখে বুঝি বিষাদের ছায়া নামে। চারিদিকে গভীর প্রশান্তি ও আনন্দের হিল্লোল। আর তাব মাঝে সে কিনা চলেছে অশান্তি ও নিরানন্দের ভগ্নদূতের মতো।

চাঁদ উঠল। শুভ্র জ্যোৎস্নায় দিগন্তবিসারী প্রান্তরে নামে স্বপ্নপুরীর মায়া—আলোছায়ার খেলা। নগর আর দূরে নয়। প্রাকারের বাইরে পরিখা দেখা যাচ্ছে—তার জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

তোরণের দুই পাশে প্রাকারসমান উঁচু দ্বাররক্ষীদের দুই প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ দুটির দুপাশে দুই দ্বার-অট্টালক অর্থাৎ প্রহরা দেওয়ার জন্য সুউচ্চ দুই মজবুত অট্টালিকা। তার পর থেকেই প্রাকারের আরম্ভ।

দ্বার-অট্টালকে আলো জ্বলছে—সশস্ত্র প্রহরীদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

দীর্ঘ প্রশস্ত এক অলিন্দ দুই অট্টালককে সংযুক্ত করেছে। একজন সশস্ত্র রক্ষী পায়চারি করছে সেখানে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সামনে প্রান্তরের দিকে। কান পেতে কী যেন সে শোনার চেষ্টা করে । তারপরেই সূতীক্ষ্ণ শব্দে তূর্য বেজে ওঠে।

অশ্বারোহী বুঝতে পারে সে রণ-তূর্যের বিপদ-সঙ্কেত।

দ্রুতপায়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ায় আরও তিনজন প্রহরী। দীর্ঘ ধনুতে বাণ সংযোজন করে তারা লক্ষ স্থির করে ধাবমান অশ্বারোহীর দিকে।

ক্ষণপরে অট্টালক থেকে চারজন সৈনিক বেরিয়ে এল। তোরণ পার হয়ে পরিখার ওপরকার সেতু অতিক্রম করে অশ্বারোহীর পথ রোধ করে দাঁড়াল তারা।

অন্ধকারে শোনা গেল গম্ভীর কণ্ঠ,—কে আসে ওখানে? পরিচয় না দিয়ে আর এগিও না।

অশ্বারোহী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তার চোখে-মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নেই।

ঘোড়ার রাশ টানতে-টানতে সে বললে,—মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেণীক বিম্বিসারের জয় হোক! আমি স্বপক্ষ, বিপক্ষ নই। পূর্ব সীমান্তের অন্তপালের কাছ থেকে গুরুতর সংবাদ দিয়ে আসছি। মহারাজের সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাতের প্রয়োজন।

তাকে নিয়ে যাওয়া হল রক্ষী-প্রধানের কাছে। অভিজ্ঞানপত্রাদি দেখে নিঃসন্দেহ হবার পর রক্ষী-প্রধান তাকে নগরে ঢোকার অনুমতি দিলে।

সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত বিশ্রামশালায় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন রক্ষী গেল সঙ্গে।

তার আগে তাকে জানানো হল, মহারাজের কাছে সংবাদ পাঠানো হয়েছে, তাঁর সঙ্গে রাত্রিবেলায় সম্ভবত দেখা হবে না।

নগরে ঢুকতেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় অশ্বারোহী। আগে সে স্বল্প

সময়ের জন্য একবার অন্তপালের সঙ্গে রাজধানীতে এসেছিল। কিন্তু মহানগরীর এ রূপ তার চোখে এই প্রথম।

দীপান্বিতা মহানগরী সাজসজ্জায় বর্ণসুষমায় আজ বুঝি দেবপুরীকেও হার মানিয়েছে। উৎসবে মত্ত সমগ্র নগরীই যেন সুরভিত। পথে বিচিত্র সাজপোশাক পরা কাতারে-কাতারে মানুষ। তাদের গলায় ফুলের মালা, অঙ্গে ফুলের আভরণ। গন্ধে বাতাস আমোদিত। অশ্বারোহীর মনে হয়, নারীপুরুষ শিশুবৃদ্ধযুবা কোনও নাগরিকই বোধহয় আজ আর ঘরে নেই।

পথে-পথে অপরূপসুন্দর সব তোরণ। দোকানে-দোকানে নানা পণ্যসম্ভার সাজানো—আলোয় ঝলমল করছে।

নির্বাক অশ্বারোহী ঘোড়ার বল্গা ধরে ভিড় ঠেলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলে। নগর-রক্ষীটি চলেছে আগে-আগে। তার হাঁকডাকে নাগরিকরা সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে, সৈনিকদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার মন দিচ্ছে নিজেদের কাজে।

স্থানে-স্থানে নানা প্রদর্শনী। কোথাও নট ও গন্ধর্বেরা বা গায়ক-বাদকেরা গানবাজনা নৃত্যগীত করছে; বীণার তারে অপূর্ব মূর্ছনা তুলে সৃষ্টি করছে মোহময় পরিবেশ। কোথাও নানা ঢঙে ভেরি বাজাচ্ছে ভেরিবাদকেরা। কোথাও সাপুড়েরা সাপখেলা দেখাচ্ছে, বানরকে খেলাচ্ছে সাপের সঙ্গে। কোথাও চলেছে বাজিকরদের খেলা। কেউ দড়ির ওপর, কেউ বা সরু বাঁশের ওপর দেখাচ্ছে নানা শারীরিক ক্রেয়াকৌশল, খেলা ও নাচ। কেউ বা দেখাচ্ছে অদ্ভুত সব ভোজবাজি ইন্দ্রজাল।

অনেকক্ষণ পরে নগরীর মাঝখানে রাজপথ চারটির মিলনস্থলে এসে তারা পৌঁছয়। আলোয় আলোময় সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বিস্ময়মুগ্ধ অশ্বারোহী যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসী সে। এই দৃশ্য, অপরূপ এ শোভা ধরাতলে কোথাও থাকতে পারে, সে ভাবতেও পারেনি কখনও। সবটাই তার কাছে ঠেকে অলীক স্বপ্নময় মায়ালোকের মতো।

যেদিকে সে তাকায়, সেদিকের দৃশ্যেরই বুঝি তুলনা হয় না। সুবিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির মাঝখানে ফোয়ারাটি আলোয় ঝলমল করছে। বিপণিগুলিও শোভায় অতুলনীয়। নাগরিকদের সাজ-পোশাকেরও বা সে কী বাহার! বর্ণে গন্ধে, নৃত্যগীত ও সুরের ঝঙ্কারে এ অঞ্চলের সৌন্দর্যমহিমার বুঝি তুলনা নেই কোথাও।

অদূরে অপার্থিব হীরক-খন্ডের মতো রামধনুর বর্ণালী আলোকচ্ছটায় জ্বলছে যেন রাজপ্রাসাদ। সেদিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে

পড়ে অশ্বারোহী। সম্মোহিত যেন। তার বিমুগ্ধ কণ্ঠ থেকে নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে,—এ যে স্বর্গের ইন্দ্রপুরী!

সঙ্গী নগর-রক্ষী দূর থেকে হাঁক ছাড়ে,—কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

এ ঘটনার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী—আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। এ কাল ভারত-ইতিহাসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়েছে। একচ্ছত্র অধিপতি বা সম্রাট কেউ নেই। ছোট-বড় নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারতবর্ষ। ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। তার মধ্যে অঙ্গ, মগধ, কাশী ও কোশল, বৃজি ও লিচ্ছবি, বৎস, অবন্তী, গন্ধার, মৎস, পঞ্চাল প্রভৃতি প্রধান। এদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভাঙাগড়া চলেছে অবিরাম।

দুইটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পাশাপাশি বর্তমান। অঙ্গ, মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী, গন্ধার প্রভৃতি রাজ্যে রাজতন্ত্র বা রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত। এদের পাশেই রয়েছে, বৃজি-লিচ্ছবি, মল্ল, শাক্য, পঞ্চাল প্রভৃতি গণরাজ্য। এখানে কোনও একজন রাজার শাসন নেই। রাষ্ট্রে ও সমাজে যারা ওপরতলার মানুষ, অভিজাত শ্রেণীভুক্ত, তারা মিলিত হয়ে পরিষদ বা সংঘ গঠন করে এবং নিজেদের মধ্য থেকে নায়ক নির্বাচন করে সেই সংঘ বা পরিষদের মাধ্যমে রাজ্যের শাসনকার্য চালায়।

ইতিহাসের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তী সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র চারটিতে রাজত্ব করছেন চারজন বিশেষ ক্ষমতাধর পুরুষ—মগধে শ্রেণীক বিম্বিসার, কোশলে প্রসেনজিৎ, বৎসে উদয়ন আর অবন্তীতে চন্ডপ্রদ্যোৎ মহাসেন। শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমে তাঁরা প্রত্যেকেই অন্যান্য রাজ্যের ওপর আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের পদভারে কাঁপছে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ।

বৈদিক ধর্মে এ সময় নিদারুণ অবনতি ঘটেছে। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের মধ্যে আর তেমন সাড়া জাগাতে পারছে না। যজ্ঞানুষ্ঠানে বাহ্যিক আড়ম্বর ও প্রাণীহত্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। বিধিনিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র ও কুসংস্কারে সমাজ আচ্ছন্নপ্রায়। জাতিভেদ আরও কঠোর হয়েছে, আঘাত করছে জনসাধারণকে। ব্রাহ্মণদেব মধ্যেও অতীতের সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা আর নেই। ধনসম্পদ ও বিলাস-ব্যসনের প্রতি অদম্য লোভ ও আকর্ষণ তাদের জীবনকে কলুষিত করছে, তাদের চরিত্রে ঘটেছে নিদারুণ অবনতি।

তাই প্রচলিত এই ধর্মের অনুষ্ঠানে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হবে কিনা এবং কোন্ পথে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান ও মুক্তিলাভ সম্ভব, এ চিন্তা দেশের অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভে আত্মনিয়োগ করেছেন বহুজন। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন দুজন মহাপুরুষ—একজন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক শাক্য বংশের গৌতম বুদ্ধ, অন্যজন জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর।

এই সময়েরই কোনও এক সন্ধ্যায় পূর্ব সীমান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে মগধের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হল তরুণ ওই অশ্বারোহী সৈনিকটি।

॥ তিন ॥

পরদিন। প্রায় মধ্যাহ্ন।

আবার সেই ক্রীড়াঙ্গন। কিশোরদের মধ্যে শস্ত্র-প্রতিযোগিতা চলেছে।

দর্শক সমাগম আজও কম নয়। কিন্তু মহারাজ বিম্বিসার অনুপস্থিত। অভয় সমেত অধিকাংশ রাজকুমারের আসনও শূন্য পড়ে আছে। এবং মন্ত্রিপরিষদের মহামাত্য ও আর সব অমাত্যকুল এবং বিশিষ্ট রাজপুরুষগণও উপস্থিত নেই।

গত সন্ধ্যায় পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে গুরুতর বিদ্রোহের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে। তার ফলে বিম্বিসার ও অন্যান্যেরা জরুরি রাজকার্যে এত ব্যাপৃত যে, আজ উপস্থিত হতে পারেননি।

প্রতিযোগিতা এখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজন কিশোরের মধ্যে—একজন জীবক, অন্যজন গুপ্তিল। রাজ্যের অন্যতম প্রধান অমাত্য যশঃপাণির পুত্র গুপ্তিল।

গতকালই জীবক সমস্ত প্রতিযোগিতায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেছে। আজ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ছিল অন্যান্য কিশোরদের মধ্যে। সেসব শেষ হওয়ার পর এখন একমাত্র গুপ্তিলের সঙ্গেই হবে জীবকের অসিচালনার প্রতিযোগিতা।

প্রাঙ্গণের এক দিকে নতচোখে জীবক অপেক্ষা করছে।

উপস্থিত দর্শকরা গতকালই জীবক ও গুপ্তিলের অসিচালনা দেখেছেন। জীবকের জয়লাভ সম্বন্ধে তাই তাঁদের কোনও সংশয় নেই। সর্বপ্রকার ক্রীড়াযুদ্ধ ও অস্ত্রচালনায় জীবকের দক্ষতা মনে রাখার মতো—কদাচিৎ তা চোখে পড়ে।

জীবক থেকে কিছুদূরে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গুপ্তিল—বলিষ্ঠ দুর্বিনীত।

তাকে ঘিরে আরও কয়েকজন কিশোর। তাদের সবারই যোদ্ধার বেশ, অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক ও অলঙ্কার। তাদের মধ্যে কী যেন উত্তপ্ত আলোচনা চলেছে। গুপ্তিল মাঝে-মাঝে কুটিল চোখে তাকাচ্ছে জীবকের দিকে।

হঠাৎ তূর্যধ্বনি হল। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

জীবক ও গুপ্তিল এগিয়ে এল। এগিয়ে এলেন তাদের প্রধান শস্ত্রশিক্ষক—প্রবীণ আচার্য ধর্মধ্বজ।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। জীবকের হাতে উন্মুক্ত তরবারি, কিন্তু গুপ্তিলের অসি কোষবদ্ধ।

সহসা আচার্যকে উদ্দেশ করে প্রাঙ্গণ সচকিত করে গুপ্তিল উচ্চকণ্ঠে বলল,—গুরুদেব, আমি এ প্রতিযোগিতায় নামতে রাজি নই! যে নির্মাতৃক, অজ্ঞাতকুলশীল, তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকে আমি বর্তমানে সম্মানহানিকর বলে মনে করি!

ক্রীড়াঙ্গণে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। বিস্ময়ে নির্বাক সবাই। পরক্ষণে শুরু হয় গুঞ্জন-কলরব ঃ কী হল! কী হল!

বিস্ময়াহত জীবকও। তারপরেই দুই চোখ তার জ্বলে ওঠে ঃ অসহ্য! অসহ্য এই অপমান! গুপ্তিলের এত বড় স্পর্ধা আর সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব! ক্রোধে রক্তিম জীবকের সুগৌর মুখ। এখনি সে বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে গুপ্তিলের ওপর। গুপ্তিলও অসি কোষমুক্ত করেছে। জীবকের ওপর নিবদ্ধ তার ক্রুর দৃষ্টি।

স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন আচার্য ধর্মধ্বজ! কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দর্শকরাও ততক্ষণে ছুটে এসেছে।

জীবকের প্রতি গুপ্তিলের হিংসা ও বিদ্বেষ আচার্য ধর্মধ্বজের অজানা নয়। জীবককে হেয় ও হাস্যাস্পদ করতে সে যেন সবসময় উন্মুখ। তার প্ররোচনায় কিছু-কিছু শিক্ষার্থীর জীবককে নির্মাতৃক বলে উপহাস ও উত্তেজিত করার ঘটনাও মাঝে-মাঝে তাঁর কানে এসেছে।

এমনকী তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও গুপ্তিলের গোপন অভিযোগ একাধিকাবার শুনেছেন তিনি। গুপ্তিলের অভিযোগ ঃ অন্যদের তুলনায় জীবককে আচার্যদেব বেশি স্নেহ করেন। তাই শিক্ষাদানের ব্যাপারে জীবকের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বে অন্য শিক্ষার্থীরা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

এ যে কত বড় মিথ্যা, গুপ্তিল তা ভালোভাবেই জানে। তবু এই অভিযোগ তুলে অন্য শিক্ষার্থীদের মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকে সে বিরত হয়নি কখনও।

কিন্তু এ কাজ সে কেন করত? ধর্বধ্বজ প্রথমে বুঝতে পারেননি, পরে বুঝেছিলেন। দুর্নামের ভয়ে তিনি যাতে বিব্রত বোধ করেন এবং জীবককে যথোচিত শিক্ষাদানে বিরত থাকেন, সেইটাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

জীবকের সমকক্ষ হওয়ার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা তার নেই। তাই অক্ষমের হিংসা ও বিদ্বেষ এই কুটিল পথ নিয়েছিল!

গুপ্তিলের চরিত্রের এই ঘৃণ্য কুৎসিত রূপ আচার্য ধর্মধ্বজকে ভাবিয়ে তুলেছিল। স্নেহভরা মন নিয়ে বারবার তিনি বুঝিয়েছেন তাকে। ক্ষমাও করেছেন বারবার। আর নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঃ গুপ্তিল তার অপরাধ একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, প্রতিভাধর শক্তিমানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে সেদিন সে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবে না।

কিন্তু তাঁর সে আশা যে কত বড় দুরাশা আর তা এই পরিবেশে আজ এমনভাবে ধূলিসাৎ হবে, তা কী তিনি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন?

বজ্রকণ্ঠে তিনি বললেন,—তোমার স্পর্ধা বহুবার ক্ষমা করেছি গুপ্তিল, কিন্তু আর নয়! তোমার আজকার এ অপবাধ ক্ষমারও অযোগ্য! কে অজ্ঞাতকুলশীল? রাজকুমার অভয়ের পুত্র জীবক?

হ্যাঁ, গুরুদেব!—তেমনি উদ্ধত কণ্ঠেই গুপ্তিল জবাব দেয় ঃ কে ওর জননী? কী ওর মাতৃপরিচয়? আপনি জানেন? এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরাও জানেন কী? কোন মায়ের গর্ভে ওর জন্ম, তা যখন জানা নেই, তখন তাকে অজ্ঞাতকুলশীল ছাড়া কী বলা যায়?

কয়েক মুহূর্তের জন্য ধর্মধ্বজের মুখে কথা জোগায় না। কিছু-কিছু গুঞ্জন ওঠে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ঃ তাই তো, কথাটা তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়! কে ওর গর্ভধারিণী? ওর শৈশবেও তার যদি মৃত্যু ঘটে থাকে, তবু কে সে?

গুঞ্জন শুনে রাগে জ্বলে ওঠেন ধর্মধ্বজ। দৃপ্তকণ্ঠে বলেন,—এখানে তার কী প্রয়োজন? অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেওয়াই একমাত্র কাজ, মাতৃপরিচয় নয়!

লজ্জায়-অপমানে জীবক বিভ্রান্ত। অসি সে আগেই কোষবদ্ধ করেছে! এবার আচার্যের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তাঁর আয়ত দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। আচার্যের দুই পা জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে,—গুরুদেব, এ প্রতিযোগিতা থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন। অনুমতি দিন, আমি চলে যাই। এখানে আর থাকতে পারছি না।

ব্যথায় ও মমতায় ধর্মধ্বজের অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। সত্যি, জীবককে তিনি বড় ভালোবেসেছিলেন। এমন প্রতিভাধর শক্তিমান ছাত্র লক্ষে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। জীবকের মাথায় হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। শেষে আত্মসম্বরণ করে স্নেহসজল কণ্ঠে বললেন,—তাই হোক, বৎস! ভবিষ্যৎ

স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন আচার্য ধর্মধ্বজ...
তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

কর্মজীবনে গুরুর এই কথাটা শুধু মনে রেখ ঃ মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার কর্মে ও পুরুষকারে—বংশগৌরবে নয়।

তারপর গুপ্তিলের দিকে ফিরে আগুন-ঝরা কণ্ঠে তিনি বললেন,—শোন নিষ্ঠুর মানবক, শৌর্যবীর্য ও প্রতিভাকে হেয় করার চেষ্টা যদি ত্যাগ না করো, উচ্চতর ক্ষমতাধরকে ন্যায্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে যদি এমনি কুণ্ঠিত থাক, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে না কোনওদিন। আশা করব, আজ হোক কাল হোক আমার এই শেষ উপদেশ তোমার জীবনে একদিন সত্যপথের সন্ধান দেবে।

পরিশেষে দর্শকদের দিকে ফিরলেন ধর্মধ্বজ, বললেন,—প্রতিযোগিতা এখানেই ক্ষান্ত হল। এদের শিক্ষাদাতা হিসাবে আজ আমি ঘোষণা করছি যে, শুধু অস্ত্রবিদ্যায় নয়, অন্যান্য সমস্ত বিদ্যায় ও মনের ঐশ্বর্যে জীবক এদের বহু উর্ধ্বে।

॥ চার ॥

রাজগৃহে সাঁঝের আঁধার নেমেছে।

রাজসভার গুপ্ত মন্ত্রণা-কক্ষ থেকে বেরিয়ে রাজকুমার অভয় গৃহে ফিরছেন। দ্রুত পায়ে হাঁটছেন তিনি। নগরের উৎসব-আনন্দ বা অন্য কোনওদিকে তাঁর লক্ষ নেই।

আম্রকানন ও পুষ্পোদ্যান পার হয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন তিনি। দোতলার এক কক্ষে ঢুকতে-ঢুকতে ডাকলেন,—জীবক! জীবক!

একজন পরিচারক এগিয়ে এল। বিনীত কণ্ঠে বলল,—কুমারকে তো দেখছি নে।

কেন, প্রতিযোগিতা থেকে সে বাড়ি ফেরেনি?—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অভয় জিগ্যেস করেন ঃ এক্ষুনি খুঁজে দ্যাখ! বল, আমি ডাকছি।

তারপর যেন আপন মনেই বললেন,—ঘটনার যে বিবরণ শুনলাম, তাতে কী আর বাইরে আছে! লজ্জায় অভিমানে আঁধারে কোথাও হয়তো মুখ লুকিয়ে বসে আছে।

কক্ষমধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন তিনি।

সুসজ্জিত কক্ষ। সোনার বড়-বড় বাতিদানে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। তাদের উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সবকিছু ঝলমল করে। একদিকে নানা কারুকার্যময় গদি-আঁটা সিংহচর্মাবৃত অবলুস কাঠের পালঙ্ক—হেলান দিয়ে বসার হাতল-দেওয়া প্রশস্ত আরাম-কেদারা। তার সামনে আরও কতকগুলি সুদৃশ্য উঁচু আসন ও

কেদারা। দেওয়ালে বহুবর্ণরঞ্জিত নানা চিত্র—পত্রপুষ্প, পশুপাখি ও নরনারীর বর্ণাঢ্য চিত্রাবলী আলোয় জীবন্ত মনে হয়। মেজেয় মনোরম রঙিন গালিচা পাতা।

অভয়ের প্রশস্ত ললাটে চিন্তার ছাপ। মাথার কুঞ্চিত কেশদাম কিছুটা অবিন্যস্ত।

পায়চারি করতে-করতে নিজের মনে তিনি বলতে থাকেন,—সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাল প্রত্যুষেই পূর্ব সীমান্তের দিকে রওনা হতে হবে, আর আজই কিনা এই অঘটন! কী অশান্তি! কী অশান্তি! যশঃপাণির পুত্রটি যে এত নীচ, এত হীন, তা জানতাম না।

নিষ্ফল আক্রোশে অভয় হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করেন ঃ এর আগেও ছেলেটি খেলাধুলোর সময় জীবককে নির্মাতৃক বলে একাধিকবার উপহাস করেছে। আর ম্লানমুখে জীবক এসে জিগ্যেস করেছে, তার মা কে? সবারই মা আছে, তার মা নেই কেন? কে ছিলেন তার জননী?

অভয় দাঁড়িয়ে পড়েন, আপন মনে বলেন,—হায় অভাগা সন্তান! কোনও উত্তরই তোকে দিতে পারিনি। অন্য কথায় ভুলিয়েছি। যশঃপাণির পুত্রকে তখুনি সমুচিত শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বালকসুলভ চাপল্য ও ঈর্ষা মনে করে ওতে গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু আর নয়! বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসি, এবার যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে...কিন্তু জীবক গেল কোথায়?

অস্থির পদে অভয় অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ান।

—বাবা, আমায় ডাকছেন?

অভয় ঘুরে দাঁড়ালেন ঃ জীবক!

জীবকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। বললেন,—এ কী! এ কী চেহারা হয়েছে তোর! মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে! বেশভূষা, কেশপাশ সব বিপর্যস্ত! কোথায় গিয়েছিলি?

বলতে-বলতে তিনি এগিয়ে গিয়ে জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

জীবকের ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে যায়। অশ্রুর বন্যা নামে অবিরল ধারায়। সে নীরবে কাঁদে।

তার মাথায় পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে অভয় স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন, —শান্ত হ বাবা, শান্ত হ। আমি সব শুনেছি। এত বড় অপমানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি এই মুহূর্তেই করতাম, কিন্তু আগামীকাল ভোরেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমায় বিদ্রোহ দমনের জন্য পূর্ব সীমান্তে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করব।

বলতে-বলতে তিনি জীবককে নিয়ে সিংহচর্ম-আঁটা পালঙ্কে গিয়ে বসলেন।

জীবক ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছে। বললে,—বাবা, আজ আমায় আমার মাতৃ-পরিচয় বলতে হবে। আগেও আপনাকে জিগ্যেস করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

অভয় চমকে তাকালেন জীবকের দিকে। জীবকের চোখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। অব্যক্ত ব্যথায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি যেন কিছুক্ষণের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলেন। শেষে ধীরে-ধীরে বললেন,—বেশ তো, আমি ফিরে আসি। তারপর সব বলব।

না।—শান্ত দৃঢ় কণ্ঠ জীবকের ঃ আজই শুনতে চাই। অনেক দিন অপেক্ষা করেছি। এত দিন ওরা যখন আমায় নির্মাতৃক বলে উপহাস করেছে, আমি তখন নিজেকে মনে করেছি দুর্ভাগা মাতৃহারা বলে। মনে করেছি, শৈশবেই বুঝি মা আমায় রেখে মারা গেছেন। কিন্তু আজকের ঘটনার পর সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আরও কিছু আছে।

বলতে-বলতে সে অভয়ের পা জড়িয়ে ধরল। বলল,—আমি আর সহ্য করতে পারছি না, বাবা। আমার মাতৃ পরিচয়ে কী এমন রহস্য ও গোপনীয়তা লুকিয়ে আছে, যা সহজে বলা যায় না, যার জন্য আমায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে? কাল ভোরেই গুরুতর কাজে আপনি রওনা হচ্ছেন, জানি। এ সময় আপনাকে বিরক্ত না করতে হলে আমিই বোধহয় সবচেয়ে সুখী হতাম। শুধু একটা কথা বলুন, কে আমার মা ছিলেন।

জীবকের কণ্ঠে যেমন আকুতি তেমনি দৃঢ়তা। মিনতিভরা জিজ্ঞাসু চোখে সে তাকিয়ে আছে অভয়ের দিকে। ব্যথাহত দুই চোখে অশ্রু টলমল করছে।

অভয় জানতেন, ভবিষ্যতে এমন দিন হয়তো আসবে, যেদিন জীবকের এই মহাজিজ্ঞাসার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আজই তো তিনি এজন্য প্রস্তুত নন।

বড় বিচলিত বোধ করেন তিনি। স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তাঁর মনে চলেছে তুমুল ঝড় ঃ কী বলবেন? কী উত্তর দেবেন তিনি? এ মহাজিজ্ঞাসার হাত থেকে আজকের মতো—শুধু এইবারটির মতো—কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

শেষে জীবকের মাথায় হাত রেখে অভয় তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। আবেগে গলা কাঁপছে তাঁর। বললেন,—বাবা, কেন এত উত্তেজিত হচ্ছ?

শান্ত মনে একটু ভেবে দেখ, কাল ভোরেই যেখানে আমায় দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছে, সেখানে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মতো অবসর বা মানসিক অবস্থা থাকার কথা নয়। তা ছাড়া বয়সে তুমি এখনও বালক। পরেও এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। জীবক! বাবা! জাতকের সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে মানুষ। লজ্জা, ঘৃণা ও কলঙ্কের ভয়, সে তো মানুষের মনে। তাকে জয় করাতেই তো পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব।

অভয়ের কথা শুনতে-শুনতে বিস্ময়াহত জীবক স্তব্ধ হয়ে যায় : তবে কী সত্যই তার জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত, যা সহজে বলা যায় না?

তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল,—বাবা!

অভয় চমকে উঠলেন। জীবকের এমন আর্তকণ্ঠ তিনি আর কখনও শোনেননি। ওর দুই চোখের বিহ্বল নিষ্পলক দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ, বলছে,—বাবা, আপনার কাছে জীবনে আর কোনওদিন আমি কোনও প্রার্থনা জানাব না। আজই এই শেষ প্রার্থনা। এই দুঃসহ লাঞ্ছনা-অপমানের হাত থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন। আর বয়স! শুধু বয়স দিয়েই কী মানুষের বিচার চলে?

অভয় বসে থাকেন পাথরের মতো। সব কথাই বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। দেয়ালের গায়ে আঁকা হরিণ শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন নির্বাক চোখে। পলে-পলে সময় কেটে যায়। পদপ্রান্তে বসে আছে জীবক, তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। বোবা কান্না যেন জমাট বেঁধে নিথর হয়ে আছে তার চোখে মুখে।

সে দৃষ্টি অভয় সহ্য করতে পারেন না। অন্য দিকে মুখ ফেরান। শেষে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,—বেশ, তাই হোক। নিয়তি! নিয়তি কারও বাধ্য নয়! বেশ, শোনো। কিন্তু তার আগে কথা দাও, বীরের দৃঢ়তা নিয়ে খাঁটি মানুষের মতো সে সংবাদ তুমি গ্রহণ করবে। প্রার্থনা করি, তোমার চরিত্রে যেসব শ্রেষ্ঠ গুণের সমাবেশ দেখেছি, তা যেন তোমায় সদাসর্বদা রক্ষা করে বর্মের মতো।

স্থির অচঞ্চল চোখে জীবক তাকিয়ে আছে। ভেতরে যে উত্তেজনার ঝড় উঠেছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই।

অভয় যেন মনস্থির করতে পারেন না। বললেন,—বাবা, তুই-ই আমার সব, আমার ছেলে, আমার সবকিছু। তুই তো জানিস, তোকে দু-দণ্ড না দেখলে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। তোর চেয়ে স্নেহের, তোর চেয়ে আপন এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে?

বলতে-বলতে অভয়ের গলা ধরে এল।

জানি, বাবা।—ধীর কণ্ঠে জীবক বললে,—আপনি বলুন।

কিন্তু অভয় তবু বলতে পারেন না। কে যেন তাঁর গলা চেপে ধরেছে। নিষ্পাপ কিশোর! ও কী সহ্য করতে পারবে সে দুঃসংবাদ?

শেষে জোর করে অস্ফুট রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন,—তোর জন্ম-পরিচয় আমার জানা নেই বাবা! তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম!

হঠাৎ বুঝি বজ্রপাত হল। ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে জীবক। পৃথিবী ঘুরে ওঠে তার চোখের সামনে।

কুড়িয়ে পেয়েছিলেন!—কিছুক্ষণ পরে আচ্ছন্নের মতো সে টেনে-টেনে উচ্চারণ করে কথাটা।

তার বোধশক্তি যেন অসাড় হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে সে চেয়ে থাকে অভয়ের মুখের দিকে।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। শেষে হঠাৎ যেন তার সংবিৎ ফিরে এল।

আমি তাহলে কেউ নই!—বলতে-বলতে সে চোখ বুজল।

নিস্তব্ধ কক্ষ। জীবকের মাথায় হাত রেখে নিশ্চল বসে থাকেন অভয়।

জীবক শেষে চোখে মেলে এক সময়। সে চোখে অশ্রু নেই। বিমূঢ় শূন্য দৃষ্টিতে আবার সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে। শেষে ধীরে-ধীরে বললে,—কী ঘটেছিল সে সময়?

অভয় যেন শুনতে পান ওর অন্তরের হাহাকার। আর মানসিক অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকেন। কিন্তু তীর ছোড়া হয়ে গেছে, আর ফেরাবার পথ নেই। ভগ্ন কণ্ঠে একসময় তিনি শুরু করেন রহস্যে ঘেরা সেই আজানা ইতিহাস।

বলেন,—আজ থেকে বোধহয় পনেরো-ষোলো বছর হবে, একদিন ভোরবেলায় উদ্যানে বিচরণ করছি, এমন সময় দূরের আমবাগান থেকে ভেসে এল এক শিশুর কান্না। অবাক হয়ে ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ করে। গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য! এক বালিস্তুপের ওপর পড়ে আছে এক সদ্যোজাত শিশু—রূপবান দেবশিশু যেন। দেখামাত্র কেন জানি না, কী এক অজানা-স্নেহ-মমতায় আমার অন্তর ভরে উঠল। শিশুটিকে ঘিরে এক ঝাঁক কাক বসে ছিল। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে শিশুটিকে আমি গভীর আবেশে বুকে তুলে নিলাম। তারপর অনেক চেষ্টা করেছিলাম তার জনক-জননীর খোঁজ পাওয়ার জন্যে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, কোনও সংবাদই পাইনি। সেই থেকে শিশুটিকে আমি পুত্রস্নেহে লালন-পালন করে আসছি। প্রতিকূল পরিবেশে শিশুটি জীবিত ছিল বলে তার নাম রাখি 'জীবক'

নিশ্চল মূর্তির মতো জীবক বসে থাকে। শূন্য চোখে চেয়ে আছে গবাক্ষ পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে। শেষে ছোট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে একসময় সে উঠে দাঁড়াল, পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

অভয় জিগ্যেস করলেন,—কোথায় যাচ্ছিস?

জীবক যে সম্মোহিত—বাহ্যজ্ঞানরহিত। কথাটা তার কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে যায় আগের মতোই।

অভয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। বললেন,—বাবা, তোর অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু এ তো বিধিলিপি! একে মেনে নিতেই হবে। ওরে, আমি তো আছি! তুই-ই যে আমার সব!

আমায় একটু একলা থাকতে দিন।—যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল জীবকের কণ্ঠস্বর। নিজেকে মুক্ত করে সে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন অভয়। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিরুপায় কণ্ঠ থেকে অস্ফুট বেরিয়ে আসে—হায় রে অভাগা সন্তান, এ ব্যথা কী শুধু তোরই! কাঁদছিস কী তুই একা!

কিন্তু তিনি এখন কী করবেন? জীবককে এ অবস্থায় রেখে কী করে দূরদেশে যাবেন তিনি?

অস্থির পদে অভয় ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন।

কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কী? পূর্ব সীমান্তের অন্তপাল বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা খুবই গুরুতর। তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ বিদ্রোহ এটা নয়। তাঁর দৃঢ় ধারণা, এ বিদ্রোহের মূলে আছে অঙ্গরাজের গভীর চক্রান্ত —এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ তাঁর হাতে এসেছে তাতে দেখা যায়, অঙ্গ-রাজধানী চম্পা নগরীর রাজসভাই এই বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মূল উৎস।

অভয়ের দুই হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। পায়চারি করতে-করতে মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছেন তিনি, তাকিয়ে থাকছেন বাইরে অন্ধকারের দিকে। কিছুই স্থির করতে পারছেন না।

অন্তপালের বিবরণ অনুযায়ী অবস্থা এমনিতেই গুরুতর, তার ওপর আছে রাজ-অনুজ্ঞা। মহারাজ বিম্বিসার একাধারে তাঁর পিতা ও রাজা। তিনিই ন্যস্ত করেছেন এই গুরু দায়িত্বভার। এই শেষ মুহূর্তে তার কোনও পরিবর্তন তো সম্ভব নয়। সুতরাং—সুতরাং—

মনের জ্বালায় অভয় ছটফট করতে থাকেন। জীবকের কী হবে? সুতীব্র আঘাতের যন্ত্রণায় তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। এ সময় তার পাশে থাকা

একান্ত দরকার। বুদ্ধি-বিবেচনা তার যতই থাক, বয়সে সে বালক। আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মারাত্মক যদি কিছু করে বসে!

কিন্তু হায়! না গিয়েও যে তাঁর উপায় নেই। একদিকে গুরু কর্তব্য ও রাজাদেশ, অন্য দিকে গভীর অপত্যস্নেহ—নিরুপায় অভয় অন্তর্যাতনায় ছটফট করতে থাকেন।

॥ পাঁচ ॥

জ্যোৎস্নাময়ী নিশুতি রাত্রি—নিস্তব্ধ নিথর। পাতলা কুয়াশা নেমেছে পৃথিবীর বুকে। গভীর ঘুমে অচেতন বিশ্বচরাচর—শুধু একজন ছাড়া।

অন্ধকার অলিন্দে দেয়াল ঠেস দিয়ে জীবক দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরে-প্রহরে দূরে শেয়াল ডেকে গেছে। কিন্তু জীবক নিশ্চল। শূন্যদৃষ্টি তার দূরে নিবদ্ধ, যেখানে উদ্যানে চলেছে আলোছায়ার খেলা। দুই চোখ যেন জ্বলছে অন্ধকারে। জমাটবাঁধা অন্তর্জ্বালা ও নৈরাশ্যের আগুন সমস্ত অশ্রু বুঝি শুষে নিয়েছে।

মনে তুমুল ঝড়—এলোমেলো অসংলগ্ন ভয়ঙ্কর চিন্তার ঘূর্ণি,—কে সে?...বাবা নেই, মা নেই...কার সন্তান—কোনও পরিচয় নেই...বিরাট বিশ্বে পরিচয়হীন নিঃসঙ্গ জীবন...একলা পথ চলতে হবে...ত্রিসংসারে কেউ নেই...

অভয়ের কথা মনে পড়ে। মানসপটে জেগে ওঠে অপরূপ এক পিতৃমূর্তি। স্নেহে সমবেদনায় সে মূর্তি যেন দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিতে চাইছে। কিন্তু...কিন্তু তিনি তো পালক-পিতা! সন্ধ্যার পর আরও কয়েকবার এসেছিলেন তিনি, নানাভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্নেহের তুলনা নেই...

কিন্তু...কিন্তু সে কী পালক পিতার পরিচয় সম্বল করে জীবনের পথ চলবে?...

পাগলের মতো জীবক মাথা ঝাঁকায়,—অসম্ভব!...গোত্র-পরিচয়হীন জীবন...আগুন ঝরা দগ্ধ মরুর বুকে নিঃসঙ্গ সে...সব ফাঁকা...সব শূন্য...বিশ্বভুবনে সবার কৃপার ও উপহাসের পাত্র...উঃ! অসহ্য! অসহ্য!...

দু-হাতে মুখ ঢাকে জীবক। মস্তিষ্কের কোষে-কোষে ঘূর্ণিঝঞ্ঝার নিদারুণ যন্ত্রণা।

একসময় আবার সে তাকায় স্তব্ধ রজনীর দিকে।

কুয়াশা...আগে-পিছে শুধুই কুয়াশা আর অন্ধকার...কোথা থেকে সে এসেছে, সে জানে না, অভয় জানেন না, কেউ জানে না...শুধুই গ্লানি, শুধুই কলঙ্ক...কী দরকার এই কলঙ্কময় অস্তিত্বে?...কী দরকার এই গ্লানিকর জীবনধারণে?...

না, স্বপ্ন নয়, চোখের ভুলও নয়। ওই তো স্পট দেখা
যাচ্ছে শুভ্র বসনে ঢাকা ছায়ামূর্তি। তাকে ডাকছে

জীবক সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথার মধ্যে বুঝি আগুন জ্বলছে।

আত্মঘাতী!...হ্যাঁ, আত্মঘাতী হবে সে! নিজেকে মুছে দেবে সে পৃথিবীর বুক থেকে। এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই!

হঠাৎ তার কানে বাজে গুরুদেবের কথা ঃ মনে রেখ বৎস, মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার কর্মে ও পুরুষকারে, বংশগৌরবে নয়...

নীরব ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে জীবকের মুখে,—কর্ম পুরুষকার!...পরিচয়হীন নীড়হীন জীবনে কী হবে ওসব দিয়ে!...

না, অহস্য—অসহ্য এ অস্তিত্ব! কলঙ্কময় জীবনের বোঝা সে বইতে পারবে না—পারবে না—পারবে না!—দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলো বলতে-বলতে জীবক শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়ায়। শয়নকক্ষেই রয়েছে তরবারিখানা।

কিন্তু ও কী!—দূরে আমবাগানে নজর পড়তেই জীবক হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো—কী ওখানে? পাতলা কুয়াশার মাঝে ক্ষীণ এক আলোক-শিখা—আর কী ও? এক আবছা ছায়ামূর্তি যেন! হ্যাঁ, ছায়ামূর্তিই—কিন্তু ও কী! ছায়ামূর্তি যে তাকে হাত তুলে ডাকছে।

সে কী স্বপ্ন দেখছে? জীবক চোখ রগড়ায়। না, স্বপ্ন নয়, চোখের ভুলও নয়। ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শুভ্র বসনে ঢাকা ছায়ামূর্তি। তাকে ডাকছে।

অভিভূত জীবক চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মোহাচ্ছন্ন যেন। তারপর অলিন্দ পার হয়ে, শয়নকক্ষ অতিক্রম করে, সোপানশ্রেণী বেয়ে সে নিচে নেমে দরজা খুলে তীরবেগে ছোটে সেই আলোর শিখা লক্ষ করে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জীবক অবাক,—কেউ নেই কোথা! শুধু এক বালিস্তূপের ওপর এক বাতি জ্বলছে। বাতাসে কাঁপছে তার ক্ষীণ শিখা। কিন্তু তার নিচে কী ওটা?

জীবক ছুটে যায় সে দিকে। সাদা রঙ-করা চতুষ্কোণ এক কাষ্ঠফলক। দুধের মতো শুভ্র ফলকটার ওপর লাল রঙে কী যেন লেখা। কম্পিত হাতে জীবক তুলে নেয় ফলকখানা। মুক্তার মতো সাজানো অক্ষরমালা, জীবক দ্রুত পড়ে যায় ঃ

পুত্র!

অস্থির হয়ো না, পথভ্রষ্ট হয়ো না। মহৎ কর্মেই মানুষের পরিচয়। ভবিষ্যৎ জীবনে কত বাধা-বিপত্তি আসতে পারে। তাতে বিচলিত হয়ো না, অধীর হয়ো না! জীবসেবার ব্রত নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাও। আশীর্বাদ করছি পুত্র, জীবনে তুমি উজ্জ্বল কীর্তি

স্থাপন করবে। ফলকখানা সাবধানে রক্ষা করো। ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন হতে পারে।

জীবক বিহ্বল হতভম্ব।

আবার সে পড়ে লেখাটা—একবার—দুবার—তিনবার—

কে? কে লিখল কথাগুলো? কেন? কী উদ্দেশ্যে? তার ভালো-মন্দে কী প্রয়োজন লেখকের? কী সম্পর্ক তার জীবনের সঙ্গে?

আবারও সে পড়ে ফলকের লেখাটা : পুত্র!...কে পুত্র?...

গভীর চিন্তায় ডুবে যায় জীবক। মন যেন অন্ধকারে পথ খোঁজে পুত্র!... পুত্র!...কে তাকে ডাকে পুত্র বলে?...

মা!...বাবা!...

কথাটা মনে হতেই অনাস্বাদিত কী এক আনন্দের শিহরণে হঠাৎ তার দেহ-মন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে...কিন্তু ফলকটার নিচে তো কারও নাম নেই! তাহলে—তাহলে কী কেউ নয়...মা-বাবা নয়?...

কিন্তু মন যেন সায় দিতে চায় না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে যেন বলছে, না না, তাঁরাই কেউ! তাঁরা ছাড়া কীসের টানে আর কে আসবে এখানে এ সময় এই গভীর রাতে!

জীবকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মনের ওপর কোথা থেকে যেন স্নিগ্ধ বসন্তসমীরণ এসে নিবিড় শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। কী এক অদ্ভুত সুখের অনুভূতিতে তার মনপ্রাণ ভরে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে,—কে—কে তুমি?...নিয়তি?...না, স্পষ্ট দেখেছি ছায়ামূর্তি...মা কিংবা বাবা, দুজনের একজন কেউ নিশ্চয়ই... তাহলে—তোমরা তাহলে কাছে-কাছে আছ সর্বক্ষণ...পুত্রের প্রতি অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি মেলে জেগে আছ সারাক্ষণ! আঃ!

কাঠের ফলকখানা দু-হাতে বুকে চেপে ধরে জীবক কাঁপতে-কাঁপতে সেখানে বসে পড়ে। চোখে নামে অশ্রুর বন্যা। চোখ বুজে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে,—আজ আমি নিঃসন্দেহ, আমার জন্মরহস্যের যবনিকা এক দিন উঠবেই...তাই তো ফলকখানা তুমি সাবধানে রাখতে বলেছ, তখন এটা দরকার হতে পারে।...আঃ কী শান্তি!

ধীরে-ধীরে জীবক কাঠের ফলকখানা আবার ধরে সামনে। চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি। আবার পড়ে লেখাটা। ধীরে-ধীরে বলে,—বেশ, তাই হোক, তোমার স্নেহাশিস মাথায় তুলে নিচ্ছি। জীবসেবার ব্রত নিয়েই আমি এগিয়ে যাব। জীবন-হননের শিক্ষা নিয়েছি এতকাল, এবার জীবন-রক্ষার সাধনায় ব্রতী হব...

কাঠের ফলকখানা বুকে চেপে জীবক সেখানে বসে থাকে—যেন বাহ্যজ্ঞানরহিত। কতক্ষণ কেটে যায়! পলে-পলে পার হয়ে যায় রহস্যময়ী স্তব্ধ রাত্রি।

হঠাৎ অর্ধ-অচেতন আচ্ছন্নতার ঘোর থেকে সে যেন জেগে উঠল একসময়। কাঠের ফলকখানা নিয়ে টলতে-টলতে ফিরে এল নিজের শয়নকক্ষে।

॥ ছয় ॥

পরদিন জীবকের ঘুম ভাঙল দেরিতে, সূর্যদেব তখন পূর্ব দিগন্তে অনেকখানি ওপরে উঠে গেছেন। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। প্রধান পরিচারক তার ডাক শুনে এগিয়ে আসতে সে জিগ্যেস করল,—বাবা কোথায়?

পরিচারক বললে,—তিনি তো খুব ভোরেই চলে গেছেন। সেনাবাহিনী নিয়ে এতক্ষণে বোধহয় রওনা হয়ে গেছেন। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন, তাই আপনাকে জাগাননি। যাওয়ার সময় বারবার বলে গেছেন আপনাকে সাবধানে থাকতে। আপনাকে বিশেষ করে জানাতে বলেছেন যে, চোদ্দ-পনেরো দিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসার চেষ্টা করবেন, আপনার সঙ্গে তাঁর অনেক গুরুতর বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জীবক যেন আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে। তারপর ছুটল সে, যদি দেখা হয় অভয়ের সঙ্গে।

কিন্তু যখন সে গিয়ে পৌঁছল, অভয়ের চতুরঙ্গ সেনা—রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিক বাহিনী তখন চতুর্দিক ধুলোয় আচ্ছন্ন করে নগরের পূর্ব সিংহদ্বার পার হয়ে চলেছে।

সবার আগে সুশিক্ষিত গজবাহিনী—হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে, ছোটখাটো পাহাড় যেন এক-একটা। তাদের পিঠে সশস্ত্র যোদ্ধার দল। গজবাহিনীর পেছনে রথীর দল। পদমর্যাদা অনুসারে ছোট-বড় প্রতিটি রথে রথী সৈনিক উপবিষ্ট। সারথি রথ চালনা করছে। তারপর পদাতিক। সবশেষে পৃষ্ঠদেশরক্ষা করে চলেছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী। সিন্ধুদেশীয় বলবান প্রকাণ্ড ঘোড়াগুলো যেন যৌবনতেজে উচ্ছল চঞ্চল।

দূর থেকে দেখা যায় অভয়ের প্রকাণ্ড রথের উঁচু চূড়া—তার ধ্বজ বা পতাকা। সেদিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে জীবক। দুঃখে মন ভার।

শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই সে বলে একসময়,—পিতা শেষমুহূর্তে দেখা হল না আপনার সঙ্গে। আপনার স্নেহ-মমতার তুলনা নেই।

এত বড় হয়েছি, বেঁচে আছি—তা-ও আপনারই দয়ায়। অজ্ঞানে আপনার কাছে হয়তো অনেক অপরাধ করেছি। তার জন্যে মার্জনা চাইছি, পিতা। দূর থেকে আপনাকে প্রণতি জানাই, প্রার্থনা করি আশীর্বাদ। ভেবেছিলাম, আপনার অনুমতি ও স্নেহাশীর্বাদ নিয়েই যাব। কিন্তু তা হল না। আবার কবে কত কাল পরে দেখা হবে, কে জানে!

গভীর চিন্তায় ডুবে যায় জীবক—হ্যাঁ, এক দিক দিয়ে এ বোধহয় ভালোই হল। যে পরিচয় সত্য নয়, তা নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে পা বাড়ানো ঠিক হতো না। এটাই বোধহয় ভবিতব্যের নির্দেশ। যে জন্ম-দুর্ভাগা, যার কোনও পরিচয়ই নেই, তাকে নিজের চেষ্টায় কর্মের মধ্য দিয়ে এ জগতে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জীবক অন্যমনস্ক—মাথায় চিন্তার ঝড়। হঠাৎ একসময় তার খেয়াল হয়, সৈন্যবাহিনী কখন নগরদ্বার অতিক্রম করে গেছে, পথের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে—একলা।

কিশোর-অন্তর তোলপাড় করে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সে ফিরে চলে। গত রাত্রের সেই কাষ্ঠফলকের রক্তাক্ষরমালা তার চোখের সামনে ভাসছে ঃ পুত্র! জীবসেবার ব্রত নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাও!...

কিন্তু নির্বান্ধব এই অজানা বিশ্বে কোন পথে কোথায় গেলে তার এই ব্রত সফল হবে?

চলতে-চলতে জীবক দাঁড়িয়ে পড়ে,—আঃ! পিতা অভয় ছাড়াও ধরিত্রীর বুকে এমন মিষ্টি করে পুত্র বলে ডাকার তাহলে আরও একজন আছে! কে তুমি! বাবা? মা? মা-ই বোধহয়। মায়ের স্নেহ কী জানিনে। এই বোধহয় মাতৃস্নেহ। এই স্নেহের দুর্বার আকর্ষণে তাই তো গতকাল গভীর নিশীথে তুমি ছুটে এসেছিলে, অলক্ষ্যে থেকেই মায়ের মন নিয়ে বুঝেছিলে, পুত্রের জীবনে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তুমি না গেলে সেখানে কালো যবনিকা নামতে পারে।...মা! মাগো!

তরুবীথির অন্তরালে দাঁড়িয়ে জীবক নীরবে কাঁদে। গত রাতের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে মায়ের আসনে বসিয়ে পূজা করে অশ্রুর অর্ঘ দিয়ে।

শেষে মনে-মনে বলে,—হ্যাঁ, জীবসেবা, মানুষের সেবাই হবে আমার জীবনের ব্রত। আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করব, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করব। আমি হব, মর্তের ধন্বন্তরি।...কিন্তু কোথায় কীভাবে পাব এই শিক্ষা?

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

দিগন্তপ্রসারী বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে-ওখানে দু-চারটে বড়-বড় বট অশ্বত্থের গাছ আর ছোটখাটো জঙ্গল ও ঝোপঝাড়।

প্রান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় সড়ক বা রাজপথ—নির্জন। প্রান্তরও জনমানবশূন্য। রাজপথ ধরে এক কিশোর চলেছে পশ্চিম দিকে। দূর থেকে তাকে দেখে হঠাৎ চেনা দুষ্কর—কে বলবে, এই সেই জীবক! বেশ কিছু দিন হল, সে ঘর ছেড়েছে, ছেড়ে এসেছে তার এত কালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বহু-বহু পেছনে পড়ে আছে মগধের রাজধানী রাজগৃহ।

জীবকের বেশভূষা অতি সামান্য। মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কার-আভরণ সবই সে ফেলে এসেছে। আত্মরক্ষার জন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে নেয়নি—একমাত্র একখানা তরবারি ছাড়া। কোমরে জড়ানো সাধারণ কোমরবন্ধ—সেখান থেকে ঝুলছে সেই কোষবদ্ধ তরবারি।

জীবকের লক্ষ্য তক্ষশিলা। বহু-বহু দূরে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে অবস্থিত গন্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলা—হাজার-হাজার ক্রোশ দূরে রাজগৃহ থেকে।

সবরকম বিদ্যাচর্চার সবচেয়ে বড় পীঠস্থান তক্ষশিলা। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষারও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগে শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য লাভ করতে হলে তক্ষশিলায় যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে হাজার-হাজার ছাত্র সেখানে যায় বিদ্যালাভের জন্য।

পূর্বাঞ্চল থেকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের তক্ষশিলা নগরী যাওয়ার পথ শুধু সুদীর্ঘই নয়, অত্যন্ত দুর্গম ভয়ঙ্করও বটে। পথে পড়ে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত বিশাল সব বনভূমি, জলহীন নির্জন মরুকান্তার এবং বড়-বড় খরস্রোতা নদ-নদী।

সে পথে পার হতে হয় ছোট-বড় অনেক স্বাধীন রাজ্য। বৃজি-লিচ্ছবি

গণরাষ্ট্র পাশে রেখে অতিক্রম করতে হয় মল্ল গণরাষ্ট্র, কোশল, পঞ্চাল, মৎস্য, কুরু, মদ্র, কেকয় প্রভৃতি দেশ।

নৃশংস ভয়ঙ্কর নানা দস্যুদল সেসব পথে ওত পেতে থাকে। সামান্য অর্থের জন্য মানুষ খুন করতেও তারা ইতস্তত করে না।

পদে-পদে এমনি আরও কত মৃত্যুফাঁদ!

এই দুর্গম পথ পার হয়ে সাধারণত ধনী অভিজাতবংশীয় ছাত্রেরাই সেখানে যায় বিদ্যালাভের জন্য! তারা যায় লোকজন নিয়ে রথ, অশ্ব প্রভৃতি যানবাহনে করে।

পিতা অভয়ের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে জীবকও তাই যেতে পারত। শুধুই কী তাই! গন্ধার মগধের মিত্র রাজ্য। গন্ধার-রাজ পুষ্করসারীর সঙ্গে মহারাজ বিম্বিসারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। অভয় অনুরোধ করলে মহারাজ বিম্বিসার পুষ্করবাসীর কাছে সানন্দে ব্যক্তিগত পত্র লিখে দিতেন। আর তাহলে তক্ষশিলার সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে জীবকের পক্ষে কোনও বাধাই থাকতো না।

কিন্তু জীবক তা চায়নি। তাই নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় সে পথে নেমেছে। দৃঢ় কঠিন সঙ্কল্প তার ঃ হয় নিজের চেষ্টা ও কর্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে, না হয়তো জীবন দেবে, তবু কারও সাহায্য আর গ্রহণ করবে না।

দিনের পর দিন সে এগিয়ে চলেছে পদব্রজে—নিঃসঙ্গ। চলার বিরাম নেই। অপরিচিত দেশ—অজানা পথঘাট। সহায়সম্বলহীন অনাথ ছাত্র হিসাবে সে নিজের পরিচয় দেয় মানুষের কাছে। এমনি করে যে দীর্ঘ কঠিন পথ সে ইতিমধ্যে পার হয়ে এসেছে, তা অতুল বিত্তবিভবের মধ্যে পরম স্নেহযত্নে লালিতপালিত, রাজকুমার অভয়ের একমাত্র স্নেহের দুলালের পক্ষে যে কী কষ্ঠদায়ক, তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়।

শুষ্ক রুক্ষ চোখেমুখে কালি পড়েছে। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। মাথায় কোথায় সেই কুঞ্চিত কেশরাশি, কেশরাগ বা গন্ধতেল দিয়ে যার পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকত দাসদাসীরা! তার বদলে সেখানে একরাশ রুক্ষ চুলের বোঝা। সামান্য যে বেশভূষা, তা-ও অত্যন্ত ময়লা, স্থানে-স্থানে ছিঁড়েও গেছে।

রসনাতৃপ্তিকর সুস্বাদু চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাদ্য ছাড়া যার মুখে কিছু রুচতো না, দুগ্ধফেননিভ শয্যা ছাড়া যার ঘুম হতো না, আজ তার যে আহার ও আশ্রয় জুটছে, তা তার বাড়ির দাসদাসীরাও কল্পনা করতে পারে না। এ খাদ্যও নিয়মিত নয়। পর্যাপ্তও নয়। আশ্রয়ও অনিশ্চিত—যত্রতত্র। গ্রামে জনপদে

কখনও গৃহস্থ বাড়িতে, কখনও বা অনাথ আশ্রমে বা পান্থশালায় খাদ্য ও আশ্রয় জোটে, কখনও জোটে না।

আজ দুপুরে হয়তো কিছুই জুটতো না। অনেক কষ্টে শেষপর্যন্ত এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে কিছুটা যবের মণ্ড জোগাড় করতে পেরে সে বর্তে গেছে। তাই দিয়ে কোনওরকমে ক্ষুধা শান্তি করে আবার পথে নেমেছে সে।

জীবক নীরবে পথ চলছে, নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মগ্ন। পেছনে কোথায় পড়ে আছে মগধ ও রাজগৃহ, আর সামনে কোথায় কত দূরে গন্ধার ও তক্ষশিলা! শেষপর্যন্ত তক্ষশিলায় গিয়ে সে পৌঁছতে পারবে তো!

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, সীমাহীন পথশ্রমে পা যেন আর চলতে চাইছে না। তবু যথাসাধ্য জোরে হাঁটছে না। একজন লোকের কাছে শুনেছে, প্রান্তর পার হলেই বড় এক জনপদ পড়বে। সূর্যাস্তের আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। খাদ্য ও বিশ্রামের জন্য মন তার ব্যাকুল! বেলা থাকতে না পৌঁছতে পারলে ভাগ্যে ও দুটো জুটবে কিনা সন্দেহ।

নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে তার জীবনের মণিকোঠায়—কোনওটা মধুর, কোনওটা ভয়াল, কোনওটা বা অভিনব। সেইসব কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছে সে।

কিছু দিন আগে এক জনপদে অবস্থাপন্ন এক সহৃদয় গৃহপতির বাড়িতে তার আশ্রয় জুটেছিল। গৃহপতি ও তাঁর স্ত্রীর আদর-আপ্যায়নে মন তার ভরে ওঠে। কথাচ্ছলে গৃহপতি একসময় তার নাম-ধাম ও পরিচয় জিগ্যেস করেন।

সর্বত্র সে যা বলে, এখানেও তাই বলেছিল। জানিয়েছিল—সে অনাথ, দেশ বারাণসী, বিদ্যার্জনের জন্য যাচ্ছে তক্ষশিলায়।

প্রথম-প্রথম মিথ্যা কথাটা বলতে সে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করত। মুখে বাধতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের মনকে সে শক্ত করেছে এই বলে যে, সহায়সম্বলহীন জীবনে মহৎ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এটুকু মিথ্যার আশ্রয় না নিলে চলবে না। তাছাড়া কথাটা এক দিক দিয়ে মিথ্যাও তো নয়।

বৃদ্ধ গৃহপতি তার এই ক্ষুদ্র পরিচয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা, তখন সে বুঝতে পারেনি। বুঝল পরে।

আহার ও বিশ্রামের পর সে রওনা হতে যাবে, গৃহপতি ও তাঁর স্ত্রী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। কিছুতেই তাঁরা ওকে ছাড়বেন না।

সে বড় বিব্রত বোধ করে। কেন তাঁদের এই আপত্তি, পথ-থেকে আসা অজ্ঞাতকুলশীল একটি ছেলের ওপর কেনই বা এই স্নেহ, বুঝতে না পেরে সে উদ্বেগও বোধ করে মনে-মনে।

শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ গৃহপতি যখন তার দুহাত হাত ধরে সজল কণ্ঠে বললেন,—এই রাতটা তুমি থেকে যাও বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, তখন স্নেহের সে দাবি কোনভাবেই সে এড়াতে পারে না।

সন্ধ্যার পর প্রকাশ পেল সব রহস্য। গৃহপতি নিঃসন্তান। জীবককে দেখে, তার ব্যবহার ও কথাবার্তায় তাঁদের গভীর স্নেহ জন্মেছে তার ওপর। তাঁদের একান্ত বাসনা, সে তাঁদের কাছে থেকে যাক পুত্র হিসাবে। বিদ্যাজর্নের জন্য তার তক্ষশিলায় যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরাই করে দেবেন। সে যে কী করে অনাথ ও কুলগোত্রহীন হয়, তা তাঁদের বুদ্ধির অগম্য।

কী কষ্টে যে জীবক সেই দুই নিঃসন্তান বৃদ্ধ-বৃদ্ধার স্নেহের নিগড় থেকে সেবার বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। বিদায়-ক্ষণের তাঁদের সেই অসহায় মুখচ্ছবি ও চোখের জল সে বোধহয় জীবনে ভুলতে পারবে না।

আর একবারের ঘটনা। পথে যেতে-যেতে সে সঙ্গী খুঁজছে—তক্ষশিলাগামী কোনও দলের সঙ্গ না পেলে গন্তব্যস্থলে শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা কে জানে!

সেদিন সে শ্রাবস্তীতে গিয়ে পৌঁছেছে। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী। ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ তার দেখা হয় একদল নটের সঙ্গে। রাজদ্বারে তারা খেলা দেখাচ্ছে। ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজি দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করাই তাদের কাজ। দলের প্রধান দুই ভাই মুসিল আর মুষ্টিক। তাদের চেয়ে বড় ইন্দ্রজালিক নাকি সে অঞ্চলে আর নেই।

সত্যিই, অত্যাশ্চর্য তাদের ভোজবাজি! অনেক ভোজবাজি সে দেখেছে, কিন্তু তাদের খেলা দেখে সে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। আজও সে বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। আজো সে ভেবে পায় না, কী করে ওসব সম্ভব হয়।

তারা তখন খেলা দেখাচ্ছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ইন্দ্রজালের সাহায্যে মুসিল সেখানে তৈরি করালো সুবিশাল উঁচু এক আমগাছ—ঘন ডালপালা পত্রপল্লবে সমাচ্ছন্ন। তার ওপরটা অন্ধকার। সরু সুতোর একটা গুলি নিয়ে তার একপ্রান্ত মুসিল ছুড়ে দিলে ওপরে সেই অন্ধকারের দিকে। মনে হল, খুব উঁচু এক মগডালে গিয়ে আটকেছে সুতোটা। সুতো ধরে মুসিল এবার ওপরে উঠে গেল। কোথায় গেল, কেউ জানে না।

হঠাৎ সবাই চমকে উঠল,—ও কী! ওপর থেকে ভেসে আসছে আর্তনাদ! পরক্ষণে উঁচু থেকে পড়তে লাগল মুসিলের রক্তমাখা কাটা সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—হাত, পা, ধড় ইত্যাদি। সর্বনাশা বীভৎস দৃশ্য! বুক চাপড়ে ছোট ভাই মুষ্টিকের

সে কী কান্না! শোনা গেল, গাছের ওপরকার পিশাচেরাই নাকি মুসিলের এই দশা করেছে। সবশেষে পড়লো তার মাথা।

মুষ্টিক এবার অন্য নটদের সাহায্যে মুসিলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যথাস্থানে ঠিকমতো সাজিয়ে নিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে তার ওপর। অমনি কী আশ্চর্য, ফুলের বিরাট এক স্তূপের সৃষ্টি হল সেখানে! তার তলায় মুসিলের দেহ অদৃশ্য। তারপরেই ফুলের গাদার নিচে থেকে নাচতে-নাচতে বেরিয়ে এল মুসিল! সর্বাঙ্গে তার ফুলের সাজ। গাছটা ততক্ষণে অদৃশ্য।

এবার এগিয়ে এল মুষ্টিক। প্রকাণ্ড এক কাঠের চিতা তৈরি হল। সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই মুষ্টিক ঢুকে গেল তার মধ্যে। লেলিহান ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখার মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য সে!

কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভে গেল। পড়ে রইল শুধু ভস্মের গাদা। মুষ্টিকের ভস্মই বোধহয়। এবার মুসিল এসে জল ছিটিয়ে দিলে ভস্মের ওপর।

সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই আশ্চর্য ব্যাপার। সেই ফুলের স্তূপ—আর তার পরেই তার তলা থেকে মুসিলের মতোই নাচতে-নাচতে বেরিয়ে এল ফুলের সাজ-পরা মুষ্টিক!

আর জীবক! বেশ কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ নির্বাক হয়ে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে খোঁজ নিয়ে জানল, নটের দলটি তক্ষশিলা পর্যন্ত যাবে না বটে, কিন্তু পশ্চিম দিকে যাবে অনেক দূর। তাহলে মন্দ কী! একা যাওয়ার চেয়ে লোকজনের সঙ্গে যতটুকু যাওয়া যায়, ততটুকুই নিরাপদ।

সে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও নানা প্রশ্নাদি করার পর, মুসিল ও মুষ্টিক গোপনে কী যেন আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে, তারপর তাকে অনুমতি দিল দলের সঙ্গে থাকার।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সে,—যাক, কিছু দিনের জন্য অন্তত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ঘটনাচক্রে তার ভুল ভাঙলো দু-তিন দিনের মধ্যেই! ওদের অভিসন্ধি টের পেয়ে সে শিউরে উঠল। সংবাদটা সে পেল ওদের একজন দাসের কাছ থেকে। লোকটা বললে, সম্মোহন বিদ্যায় মুসিল ও মুষ্টিক দুজনেই নাকি সমান পটু। তারা ওকে সম্মোহিত করে চিরকালের জন্যে দলে রাখার ফন্দি এঁটেছে।

সেই দিনই সে দল ছেড়ে পালায়।

কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বুড়ো দাসটির বাইরেটা দেখতে কী কুৎসিত ভয়ঙ্কর, অথচ ভেতরটা যেন খাঁটি সোনা, শুভ্র কোমল ফুলের মতো। লোকটাকে সবসময় কী নির্যাতনই না সহ্য করতে হয় মনিবদের কাছে! অথচ উপায়ও

...আগুন জ্বলে উঠতেই মুষ্টিক ঢুকে গেল তার মধ্যে।
লেলিহান ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখার মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য সে।

নেই। সে যে ক্রীতদাস! দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে-বয়ে জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়েছে সে। ওই দু-তিন দিনের মধ্যেই জীবককে সে বড় ভালোবেসে ফেলেছিল।

আর্ত মানবাত্মার বেদনা-লাঞ্ছনায় জীবক দীর্ঘশ্বাস ফেলে....

কিন্তু, এ কী! জীবক চমকে উঠল, প্রান্তর শেষ হয়ে যে জঙ্গল শুরু হচ্ছে! বেলাও শেষ হয়ে আসছে।

জীবক থমকে দাঁড়ায়। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ডুবে গিয়েছিল নিজের স্মৃতির অতলে। তাই লক্ষ করেনি।

লোকটা কী তাহলে ইচ্ছে করেই তাকে ভুল নির্দেশ দিয়েছে? এক অসহায় ক্লান্ত কিশোর পথিকের সঙ্গে এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

এখন উপায়?

হাঁটা ছাড়া উপায় কী! থামলে তো চলবে না, এগোতেই হবে।

জীবক আরও জোরে পা চালিয়ে দেয়।

হঠাৎ এক সময় তার কানে এল কীসের যেন ঝুটোপুটি আর গর্জন। রাজপথের পাশে কিছু দূরে বড় এক ঝোপ, সেখান থেকে আসছে শব্দটা।

সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখতে-দেখতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল দুই ভীষণদর্শন হিংস্র জানোয়ার—এক বিশালকায় ভল্লুক আর এক বন্য বরাহ। রোদে ঝকমক করছে বরাহের ভয়ঙ্কর দাঁত দুটো। সগর্জনে মরণপণ যুদ্ধে মত্ত দুজনে।

কিন্তু তা দেখার কিছুমাত্র বাসনা বা কৌতূহল নেই জীবকের। প্রাণের দায়ে সে ছুটতে শুরু করে সামনে দিকে। ওদের নজরে পড়ার আগেই তাকে পালাতে হবে।

কিন্তু জঙ্গল যে ক্রমেই গভীর হচ্ছে! খিদে ও পিপাসাও পেয়েছে অনেকক্ষণ। পিপাসাটা এখন যেন আরও বেশি করে পেয়ে বসেছে। যদি কোনও জলাশয় পাওয়া যায়, সেই আশায় জঙ্গলের আরও গভীরে ঢোকে সে।

এখানে-ওখানে টিলা-ঢিবি, ফাঁকা জায়গা, তারপরেই আবার জঙ্গল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। মানুষের চিহ্ন স্পষ্ট! ছাইয়ের গাদা ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে আছে।

জীবকের আর এগোতে সাহস হয় না। সে শুনেছে, এইসব বনে-জঙ্গলে শুধু হিংস্র জন্তুজানোয়ারই থাকে না, থাকে ভয়ঙ্কর ডাকাতের দল।

অদূরে ফাঁকা অঞ্চলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে নাম-না-জানা বিরাট এক মহীরুহ। জীবক তাড়াতাড়ি তার মাথায় গিয়ে উঠে বসল।

কিন্তু কী নিদারুণ পিপাসা! তার অন্তরাত্মা ছটফট করছে। একটু জল পেলে খিদে ও পিপাসা দুটোরই উপশম হতো—অন্তত কিছুকালের জন্য।

জীবক তাকায় চারদিকে।

সূর্য ডুবছে। বনের বুকে নামছে অন্ধকার। হঠাৎ তার চোখমুখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দূরে জঙ্গলের মাঝে দেখা যাচ্ছে এক জলাশয়।

তাড়াতাড়ি সে গাছ থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ এক হরিণ-শাবকের আর্ত চিৎকারে বনের নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে গেল। চমকে উঠে জীবক দেখে, অদূরে এক ঝোপের ধারে বিরাট এক অজগর এক হরিণ-ছানাকে কামড়ে ধরেছে। তার দেহ-কুণ্ডলীর বজ্রপেষণে মুহূর্তে ছানাটির কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরে। অজগরটি তাকে গিলতে শুরু করে।

ডালের ওপর বসে জীবক ভাবছে কী করবে। ছানাটিকে গিলে অজগরটি ধীরে-ধীরে ততক্ষণে ঝোপের নিচে অদৃশ্য হয়েছে। সহসা ফাঁকা জায়গার বিপরীত দিকের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। আর পরক্ষণে সেখান থেকে বেরিয়ে এল একদল লোক। কালো-কালো ভয়ঙ্কর চেহারা, হাতে খড়্গ, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি। জীবক শিউরে ওঠে, —দস্যু!

দস্যুরা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে কীসব পরামর্শ করে, তারপর আবার গা ঢাকা দেয় জঙ্গলের মধ্যে। জীবকের আর গাছ থেকে নামা হল না। গাছের মাথায় মগডালে উঠে গেল সে।

জঙ্গলের বুকে রাতের আঁধার গাঢ়তর হয়। দেখতে-দেখতে নিশাচর অরণ্য যেন জেগে ওঠে। বন্য জন্তুর চিৎকার, ছুটোছুটি কানে আসে। কানে আসে চাপা হুঙ্কার। দূর থেকে ভেসে এল সিংহের গর্জন। গাছের নিচে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি, ঝোপেঝাড়ে খসখস আওয়াজ!

অনেক পরে চাঁদ উঠল। ক্ষীণ মেটে জ্যোৎস্নায় অরণ্যকে মনে হয় আরও রহস্যময় ভয়ঙ্কর। তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত জীবকের নিদ্রাহীন রাত কাটে গাছের মাথায়।

॥ দুই ॥

পরদিন। ভোরে আবার রওনা হয়েছে জীবক। গ্রাম-জনপদ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে সে দিনের পর দিন।

শেষে একদিন দুপুরে বড় এক নগরে এসে সে শুনল, ভোরবেলায় বড় একদল বণিক পণ্যসম্ভারে বোঝাই বহু গো-শকট বা গরুর গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে পশ্চিম দিকে। বৈশালীর বণিক তারা। তিনদিন তারা ছিল এখানে।

ক্লান্তি, অবসাদ ও নিঃসঙ্গতা জীবককে যেন ক্রমেই আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। রাজসিক বিলাসব্যসনে প্রতিপালিত অনভিজ্ঞ কিশোর দেহ এই একটানা দুঃসহ অত্যাচার আর বুঝি সহ্য করতে পারছে না।

জীবক তাই ঠিক করেছিল, এখানে দু-এক দিন বিশ্রাম নেবে। কিন্তু তা তার হল না। সামান্য খাদ্য যা জুটলো, তাই খেয়ে তখুনি ছুটল সে বণিকদের নাগাল পাওয়ার জন্যে। বণিকদলের—হ্যাঁ, অন্য কোনও দলের আর নয়—কোনও বণিকদলের আশ্রয়ই তাকে পেতে হবে। পথে আসতে-আসতে অনেক সজ্জন ব্যক্তিও তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছেন।

সে শুনেছে, যে পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার তুলনায় সামনের পথ অনেক বেশি দীর্ঘ, দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। তাই আসবার পথে সে সর্বত্র বণিকদলের সন্ধান করেছে।

সে শুনেছে, অন্যান্য নগরের মতো চম্পা, রাজগৃহ, বৈশালীরও অনেক বণিক গো-শকটে পণ্যসম্ভার চাপিয়ে বাণিজ্যের জন্য বারাণসী, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, তক্ষশিলা প্রভৃতি নগরে যাতায়াত করে। পথে পড়ে মহারণ্য, মরুকান্তার—বিশেষত তক্ষশিলার পথে। সেখানে পদে-পদে ভয়ঙ্কর বিপদ—বিষম দুস্যুভয়। তাই বণিকেরা বহুজন দল বেঁধে সশস্ত্র রক্ষী ও পথপ্রদর্শক নিয়ে যাতায়াত করে ওসব পথে।

এমন কোনও দলের সাক্ষাৎ পেলে সে বুঝি বেঁচে যায়। অবশ্য সাক্ষাৎ পেলেই যে তাদের কাছে আশ্রয় পাবে, এমন কোনও কথা নেই। বিপদসঙ্কুল পথে অপরিচিত কাউকে সঙ্গে নিতে তারা সহজে রাজি হয় না। এজন্য তাদের, বিশেষত তাদের দলপতি সার্থবাহের বিশ্বাস তাকে যে করে হোক অর্জন করতে হবে।

জীবক যেন ছুটে চলে। অবসন্ন দেহ আর ক্লান্ত পা বিদ্রোহ করছে বারেবারে। সম্বল শুধু মনের জোর।

সেদিন কেটে যায়। বণিকদলের দেখা মেলে না। এক গ্রামে সে আশ্রয় নেয় রাতের মতো। ডাকাতের ভয়ে তটস্থ গ্রামবাসী। তাই যৎসামান্য খাদ্য জুটলেও, আশ্রয় সে পায় না কোনও বাড়িতে। এক খড়ের গাদায় রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই সে রওনা হয় আবার।

সারাদিন কেটে গেল। বেলা যত শেষ হয়ে আসে, জীবকের গতি তত মন্থর হয়। দূরে দেখা যায় আবার এক মহাবন। গভীর সে মহারণ্য গম্ভীর ভয়াল চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জীবক থমকে দাঁড়ায়। অনেক পেছনে ফেলে এসেছে শেষ গ্রাম। সেখানে

দুপুরে যে বাড়িতে তার আহার জুটেছিল, তার গৃহকর্তা তাকে বারবার নিষেধ করেছিলেন এ পথে একলা যেতে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত ও বন নাকি ভয়ঙ্কর। সেখানে আছে নিদারুণ দস্যুভয়।

এখন কী করণীয়? দিন শেষ হয়ে আসছে। অসহায় চোখে জীবক চারদিকে তাকায়।

হঠাৎ তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বনের প্রান্তে কী ও! ধোঁয়ার রেখা কুন্ডলী পাকিয়ে আকাশ পানে উঠছে।

কারা ওখানে? মানুষ, না অন্য কিছু? শত্রু, না মিত্র?

কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো চলবে না। গাছপালার আড়ালে-আড়ালে সন্তর্পণে জীবক এগিয়ে গেল।

তারপর পথের বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল, তাতে বিস্ময় ও আনন্দের উত্তেজনায় সে পথ চলতে বা কথা বলতে পারে না কিছুক্ষণ।

বনের প্রান্তে পথের পাশে প্রশস্ত এক ফাঁকা জায়গা। সেখানে বড় একদল বণিক মনে হচ্ছে রান্নার কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু—সত্যিই বণিকদল তো—না, অন্য কেউ? জীবকের মনে সন্দেহের দোলা। পথে বেরিয়ে কত না বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তার! সে বুঝেছে, সাবধানের মার নেই, নিঃসঙ্গ জীবনে এই দূর অজানা বিদেশে বিপদ প্রতি পদে ওত পেতে আছে। তাই বাঁচতে হলে, ধৈর্য ও সতর্কতা ছাড়া উপায় নেই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জীবক আড়ালে থেকে পরীক্ষা করে সবকিছু। ধীরে-ধীরে মন তার শান্ত হয়। না, বণিকদলই বটে। তাঁবুগুলির মাঝে বড় একটা তাঁবু সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে-মনে সে বলে,—ওটা দলনেতা সার্থবাহের তাঁবু না হয়ে যায় না।

তাঁবুগুলোকে বেষ্টন করে, শুয়ে বা দাঁড়িয়ে আছে সব বলীবর্দ। যেমন বিশাল তাদের দেহ, শিংও তেমনি প্রকাণ্ড ও ছুঁচলো। বলীবর্দদের ঘিরে বাইরের দিকে রাখা হয়েছে বড়-বড় শকট বা গাড়িগুলোকে। জীবক বুঝতে পারে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও দস্যুরা যাতে সহজে আক্রমণ করতে না পারে, তার জন্যেই ব্যূহ তৈরি করা হয়েছে এমনিভাবে।

জীবক এগিয়ে যায়। একটু খোঁজ নিতেই সে জানল, বণিকদল যাবে তক্ষশিলায়।

সার্থবাহের সঙ্গে দেখা করার আশায় সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যেতেই বাধা পেল।

বনপথে যাত্রা করার মুখে বণিকদল ইতিমধ্যে নিরাপত্তার জন্য দশজন সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগ করেছে। এদের বলা হয় অরণ্যরক্ষিক—এরা শুধু প্রহরী নয়, পথ প্রদর্শকও বটে।

জীবক বাধা পেল তাদের নেতা আরক্ষিকজ্যেষ্ঠের কাছ থেকে।

জীবক অনুনয় জানায়—একটিবার, শুধু একটিবার সে দেখা করবে সার্থবাহের সঙ্গে।

কিন্তু অটল আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ, কোনও কাকুতি-মিনতিই তাকে টলাতে পারে না।

ততক্ষণে সার্থবাহের কানে গেছে কথাটা—এক নিরাশ্রয় কিশোব তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি অনুমতি দিলেন।

সবিনয়ে নমস্কার করে নত চোখে জীবক গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ। জীবকের মনে শঙ্কা ও সংশয়ের ঝড় চলেছে—কে জানে আশ্রয় পাবে, কি পাবে না! যদি না পায়?

স্থিরদৃষ্টিতে সার্থবাহ তাকিয়ে আছেন, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন জীবকের। দীর্ঘকায় সুদর্শন বলিষ্ঠ কিশোর, পথশ্রমে ক্লান্ত, শীর্ণও বটে কিছুটা, কিন্তু কী যেন আকর্ষণী জাদু আছে তার চেহারায়।

শেষে মৃদুকণ্ঠে তিনি জিগ্যেস করেন,—কী তোমার বক্তব্য, বৎস?

সম্ভ্রম ও বিনয়ের সঙ্গে জীবক বললো,—অনাথ আমি, বিদ্যার্থী। বাড়ি বারাণসীতে। তক্ষশিলায় যাচ্ছি, সেখানে-চিকিৎসা-শাস্ত্র-অধ্যয়ন করার বড় বাসনা। নিঃসঙ্গ একলা আমি, কিন্তু পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিদসঙ্কুল। তাই আপনার কাছে অন্য কোনও প্রার্থনা নয়, শুধু সঙ্গে থাকার, একটু আশ্রয় পাওয়ার প্রার্থনা জানাতে এসেছি। এর প্রতিদানে আপনি যা করতে বলবেন, তা-ই করতে আমি প্রস্তুত। আপনার সমস্ত আদেশ আমি নত মস্তকে পালন করব।

বলতে-বলতে শেষদিকে জীবকের গলা ধরে আসে।

বণিকদলের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, অনেকেরই অনিচ্ছা তাকে স্থান দিতে।

আপত্তি জানায় অরক্ষিকজ্যেষ্ঠও। বলে,—এই পথে এই রাতে অজ্ঞাতকুলশীল কাউকে স্থান দেওয়া খুবই অন্যায় হবে।

সার্থবাহ বয়সে প্রবীণ—নাম তিরীট-বৎস। শুধু ধনৈশ্বর্যেই নয়, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়ও তিনি শ্রেষ্ঠীকুলে প্রধান—ধীর স্থির বিবেচক। অন্যাদের

আপত্তিতে তাঁর মন সায় দিতে চায় না। কিশোরটির দিকে তাকিয়ে বড় মমতা বোধহয়। তাঁর মন বলছে, ছেলেটিকে আশ্রয় না দিলে অন্যায় হবে। তাই ওকে বসিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি কথা বলেন ওর সঙ্গে, শেষে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন, এ কিশোরের দ্বারা আর যাই হোক অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সার্থবাহের দয়ায় জীবক আশ্রয় পেল।

রাত্রির আহারাদির শেষে শুতে যাওয়ার আগে সার্থবাহ আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ ও তার অধীন রক্ষীদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন সদা সতর্ক প্রহরায় থাকতে।

মৃদু হেসে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ বললে,—মহোদয়, আপনি শুনে হয়তো সুখী হবেন যে, আরক্ষিকের কাজ করলেও আমি ব্রাহ্মণ। আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের কোনও ক্ষতি হবে না। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।

ব্রাহ্মণ! জীবক অবাক হয়ে তাকায় আরক্ষিকজ্যেষ্ঠের দিকে। এমন নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর চেহারা হয় ব্রাহ্মণের! হবেও বা, পেশা ও কর্মের ছাপ পড়ায় চেহারা হয়তো পালটে গেছে।

আরক্ষিকজ্যেষ্ঠের কথা শুনে সার্থবাহ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে, শেষে বলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ! শুনে সুখী হলাম। নিশ্চিন্তও বোধ করছি।

তারপর সহযাত্রী বণিকদের লক্ষ করে বললেন,—আপনারা বোধহয় জানেন যে, এই অঞ্চলটা খুবই বিপদসঙ্কুল। দস্যুভয়ই প্রধান। কিছু কাল আগে আমার পরিচিত বারাণসীর এক বণিকদল এখানে দস্যুর হাতে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, জীবনহানিও ঘটেছিল। আপনারাও হয়তো শুনে থাকবেন সে ঘটনা। সেইজন্য আমাদের সবাইকে একটু সজাগ থাকতে হবে। আরক্ষিকজ্যেষ্ঠের যোগ্যতার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তবু নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নিজেরা যদি সজাগ ও সতর্ক থাকি, তাহলে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ ও তার দলের কাজও অনেকখানি সহজ হবে।

॥ তিন ॥

গভীর নিথর রাত্রি। নিস্তব্ধ মহারণ্য। সুপ্তি যেন জমাট বেঁধে চেপে বসেছে বিশ্বচরাচরের বুকে। বনমধ্যস্থ দু-একটা জানোয়ারের চিৎকার মাঝে-মাঝে সে স্তব্ধতায় আঁচড় কাটছে ক্ষণিকের জন্য। নিষ্কম্প পৃথিবী। গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

রাত বোধহয় তৃতীয় প্রহর শেষ হতে চলল। আকাশে সরু একফালি

চাঁদ। মরা জ্যোৎস্না আর পাতলা কুয়াশার আবরণ গায়ে জড়িয়ে মহারণ্য যেন শিকারের প্রতীক্ষায় গুড়ি মেরে বসে আছে। এখুনি বুঝি ঝাঁপ দেবে।

তাঁবুগুলি নীরব। সবাই ঘুমে অচেতন।

কিন্তু ঘুম নেই জীবকের চোখে। দীর্ঘ পথ-পর্যটনে ক্লান্ত সে। তার ওপর এতকাল পরে পেয়েছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পর্যাপ্ত আহার। তাই অনেক আগেই তার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু কী যে হয়েছে, কিছুতেই ঘুম আসছে না। কী এক অস্বস্তি যেন তাকে পেয়ে বসেছে সন্ধ্যা থেকে—বিশেষত দস্যুদের সম্পর্কে সার্থবাহের সাবধান-বাণী শোনার পর থেকে।

মাঝে সে একবার সন্তর্পণে বেরিয়েছিল তাঁবু থেকে। কিছু দূরে এক গাছের তলায় দেখেছিল আরক্ষিকদের।

ওরা ওখানে কেন?—তার মনে প্রশ্ন উঠেছিল। ওদের তো কর্তব্য চারদিক ঘুরে পাহারা দেওয়া। সার্থবাহকে কী বলবে কথাটা?

সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর থেকে বাধা এসেছিল—না, উচিত হবে না। একে সে বয়সে কিশোর, কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা! সে তুলনায় প্রবীণ সার্থবাহের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। তার ওপর এদের সঙ্গে তার মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। এসব বললে যদি ওদের সন্দেহ জাগে!

ও কী!—জীবক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। বাইরে কোথায় যেন একটা শিস দেওয়ার শব্দ!

জীবক উৎকর্ণ। শোনার ভুল নয় তো?...না, না ওই—ওই আবার!

জীবকের পাশেই রয়েছে তরবারিখানা, তার বড় সাধের দশার্ণদেশীয় সর্বোৎকৃষ্ট তরবারি—পিতা অভয়ের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল।

ওই আবার!—আবার ভেসে এল সেই শিসের শব্দ...

জীবকের মনে হয়, কোথা থেকে কী এক অজানা বিপদ যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে তাঁবুর দিকে।

সে উঠে দাঁড়াল। আর দেরি নয়। তববাবি হাতে সে তৈরি হয়ে সংগোপনে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। অদূরে মহাশ্রেষ্ঠী তিরীট-বৎসের তাঁবু। গা ঢাকা দিয়ে সেদিকে সে এগিয়ে যেতেই সার্থবাহের অস্পষ্ট নীচু কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—কে?

পরক্ষণে তাঁর বিস্মিত প্রশ্ন,—তুমি! তুমি এখানে! ঘুমোওনি?

তেমনি নীচু গলায় জীবক বলল,—না, ঘুম আসেনি? সন্ধ্যা থেকে কী এক অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু শিসের শব্দ শুনেছেন?

—হ্যাঁ। আরক্ষিকদেরও দেখা নেই। কোথায় গেল তারা? কিছু সময়

আগেও তাদের ওই গাছতলায় দেখেছিলাম। আচ্ছা, ওই দূরে তাকিয়ে দেখ তো, আবছা অন্ধকারে কিছু লোককে জড়ো হতে দেখা যাচ্ছে না?

সচকিত চোখে জীবক তাকায়,—হ্যাঁ, তাই তো!

সে বুঝতে পারে, সে-ই শুধু জেগে নেই, জেগে আছেন প্রাজ্ঞ মহাশ্রেষ্ঠী তিরীট-বৎসও।

লোকগুলোর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে ব্যস্তকণ্ঠে সে বললে,—সর্বনাশ! ওরা তৈরি হচ্ছে। শিগগির—শিগগির তূরীধ্বনি করুন, সবাইকে জাগান! ওরা এক্ষুনি আক্রমণ করবে!

তা বুঝতে পারছি।—বললেন তিরীট-বৎস,—কিন্তু সকলে জেগে উঠে তৈরি হওয়ার আগেই ওরা তো আক্রমণ করে বসবে! তাছাড়া আমাদের এরা কেউই তো অস্ত্রচালনায় অভিজ্ঞ নয়। ওদের আক্রমণ রোধ করব কী করে?

সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি!—দৃঢ়কণ্ঠে জীবক বললে,—আপনারা আমায় পেছন থেকে সাহায্য করবেন।

তুমি! তুমি বালক! তুমি কী দায়িত্ব নেবে?—তিরীট-বৎস যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বয়সই সব কিছুর মাপকাঠি নয়, মহাশ্রেষ্ঠী!—জীবকের কণ্ঠে আদেশের সুর, আর দেরি নয়। যা বলেছি, অনুগ্রহ করে সেই মতো কাজ করুন।

বলতে-বলতে সে মুক্ত তরবারি হাতে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

অভিজ্ঞ সার্থবাহ জীবনে এত অবাক হননি। মুহূর্তমধ্যে রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান করে তাঁর তূরী বেজে উঠল একবার—দুবার—তিনবার। মুহুর্মুহু বাজতে থাকে তূরী।

তূর্যধ্বনি কানে যেতেই দস্যুরা বুঝল, বণিকেরা তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়ার সময় তাদের আর হল না। ভীষণ হুঙ্কার ছাড়তে-ছাড়তে তারা ছুটে এল তাঁবু লক্ষ করে। সংখ্যায় তারা চোদ্দ-পনেরো জন।

ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রহাতে খানচারেক গাড়ি দিয়ে ব্যূহের দ্বারপথ আটকে জীবক উঠে দাঁড়িয়েছে সেই গাড়ির ওপর। হাতে তরবারি। জীবনে এই তার প্রথম আসল অস্ত্র-পরীক্ষা। উত্তেজনায় দেহের সমস্ত পেশি যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বারপথে শকটের বেড়া দেখে থমকে দাঁড়ায় দস্যুদল। জীবকের ওপর নজর পড়তেই অট্টহাস্য করে ছুটে এল তাদের দলপতি। তার হাতে প্রকাণ্ড খড়্গ।

দলপতিকে দেখে জীবক ভয়ানক চমকে উঠল,—আরক্ষিকজ্যেষ্ঠ! সে-ই দস্যু-দলপতি! রক্ষকই তাহলে ভক্ষক!

রাগে ও ঘৃণায় জীবকের চোখ জ্বলে উঠল। ভয়ঙ্কর কণ্ঠে সে বললে,—ওরে বিশ্বাসঘাতক নরাধাম! ব্রাহ্মণ তুই, নরকের কীট? তোর দস্যুগিরি আজ শেষ হবে।

জীবকের কথায় খলখল করে আবার হেসে ওঠে দলপতি। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে,—ওরে দুধের বালক, কথায় তো দেখছি খুব দড়। যমের বাড়ি দেখেছিস? এবার দেখ গিয়ে। যমরাজকে জিগ্যেস করিস, ব্রাহ্মণের কাজ কী শুধু যজ্ঞের হবি চাটা! হা—হা—হা—

হাসতে-হাসতে দস্যু জীবকের মাথা লক্ষ করে খড়্গ তুলল।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝলসে উঠল জীবকের তরবারি। আর তার পরেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে পেছনে ছিটকে পড়ে গেল দস্যু-দলপতি। জীবকের তরবারির আঘাতে তার হাতখানা খড়্গসমেত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেহ থেকে।

তার দশা দেখে অন্য দস্যুরা হকচকিয়ে যায়। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য। তারপরেই চিৎকার করে তারা ছুটে এল। একটা বালকের ভয়ে তারা পালিয়ে যাবে? এত ধনসম্পদ ছেড়ে? তা হয় কখনও?

জীবকের সত্যিকার অস্ত্র-পরীক্ষা এবার শুরু হয়। তেরো-চোদ্দোজনের বিরুদ্ধে সে একা। দস্যুদের মধ্যে তার তরবারি পাক খেতে থাকে। তাদের এলোপাথাড়ি আঘাত প্রতিরোধ করে চন্দ্রালোকে মুহুর্মুহু ঝিলিক দিয়ে ওঠে দশার্ণের তরবারি—বিদ্যুৎ-শিখা যেন।

সার্থবাহ ততক্ষণে দীর্ঘ বর্শা হাতে ছুটে এসেছেন। অন্যসব বণিক ও চাকরবাকরেরাও হাতের কাছে যে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে ছুটে আসছে।

পরের ধনসম্পদ লুঠ করতেই দস্যুরা ওস্তাদ—সাহসে বা অস্ত্র চালনায় নয়। অবস্থা যে খুবই সঙ্গিন, তা বুঝতে তাদের দেরি হয় না। এক বালকের হাতেই তাদের কাহিল অবস্থা। জনা সাতেক অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। তিনজনের আঘাত গুরুতর। তার মধ্যে দলপতি অন্যতম। এর পর পঞ্চাশ-ষাটজন বণিক ও তাদের ভৃত্যেরা এসে যদি ঘিরে ফেলে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

সুতরাং তারা পিছু হটতে থাকে। শেষে এক সময় পেছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। আহত সঙ্গীদেরও নিয়ে গেল যাওয়ার সময়।

অত্যাশ্চর্য! অভাবিত!

সঙ্গে-সঙ্গে ঝলসে উঠল জীবকের তরবারি।...তীক্ষ্ণ
আর্তনাদ করে পেছনে ছিটকে পড়ে গেল দস্যু-দলপতি

সীমাহীন আনন্দে সার্থবাহ জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অজ্ঞাতকুলশীল এই কিশোরের সাহস ও বীরত্ব তাঁর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। অন্য বণিকদেরও সেই অবস্থা। যারা রক্ষক তারাই যেখানে ভক্ষক, সেখানে এই কিশোর না থাকলে তাদের রক্ষা পাওয়ার কোনও আশাই ছিল না। ধনপ্রাণ সবই খোয়াতে হতো।

কিন্তু কী দরকার ছিল এই কিশোরের ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ার। সার্থবাহ কথা বলতে পারেন না। জীবনে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন প্রচুর। কিন্তু এ জাতীয় অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

।। চার ।।

আবার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এবার আর বাইরের রক্ষীদল নয়। যাত্রারম্ভের আগে জীবকের নেতৃত্বে বণিকদের নিয়ে গঠিত হয় রক্ষীদল। অস্ত্রচালনায় যাদের সামান্য অভিজ্ঞতাও আছে, তারাই সশস্ত্র হয়। সার্থবাহও অস্ত্র হাতে নেন। অস্ত্রচালনায় তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ নন। পথ দেখিয়ে নেবার দায়িত্বও তাঁর। এ পথ তাঁর অপরিচিত নয়—আগেও কয়েকবার যাতায়াত করেছেন।

দিনের পর দিন পথ চলতে-চলতে জীবকের বুদ্ধি, বিবেচনা ও অন্যের জন্য দরদবোধ দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হয় সবাই। বহুদর্শী প্রাজ্ঞ মহাশ্রেষ্ঠী যত তাকে দেখছেন, ততই বুঝতে পারছেন, এ ছেলে কখনই সামান্য কিশোর নয়, অনাথ তো নয়ই। কিন্তু এ পর্যন্ত জীবকের কাছ থেকে তিনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার পরিচয় সম্বন্ধে নতুন কিছু জানতে পারেননি।

তিনি ভাবতে থাকেন।

শকটের দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলেছে। শকট টেনে নিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড সব বলীবর্দ। শোভাযাত্রার সামনের দিকে সার্থবাহ তিরীট-বৎসের শকট।

কয়েক দিন পরে। সার্থবাহ সেদিন সকালে জীবককে ডেকে নিয়ে তাঁর পাশে বসালেন। একথা-সেকথার পর সস্নেহে জিগ্যেস করলেন,—তা বাবা, তুমি বলেছিলে, তক্ষশিলায় গিয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। তা, কার কাছে অর্থাৎ কোন অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা করবে, ঠিক করেছ?

নতমস্তকে ধীরে-ধীরে জীবক বললে,—কিছুই ঠিক করিনি। কারও নাম জানি না, কাউকে চিনিও না। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।

বিস্মিত সার্থবাহ। বললেন,—বলো কী! আশ্চর্য ব্যাপার! খোঁজ খবর না নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। তক্ষশিলায় অধ্যাপক আত্রেয় হলেন পৃথিবীখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি গন্ধারের

রাজবৈদ্যও বটে। শিখতে হলে তাঁর কাছেই শিখতে হয়। কিন্তু তাঁর কাছে তুমি শিখবে কীভাবে?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জীবক জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় তিরীট-বৎসের দিকে।

মৃদু হেসে তিরীট-বৎস বললেন,—কিছুই জানো না, দেখছি। অধ্যাপকদের কাছে দুই ধরনের শিষ্য বা ছাত্র শিক্ষা পায়। যেসব শিষ্য গরিব, আচার্যভাগ বা গুরু দক্ষিণা দেওয়ার যাদের ক্ষমতা নেই, সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাদের গুরুকে ও গুরুগৃহের অন্য সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হয়, গুরুগৃহের যাবতীয় কাজকর্মও করতে হয়। সপ্তাহে মাত্র এক দিন, নির্দিষ্ট কোনও এক রাত্রে গুরু তাদের শিক্ষা দান করেন। এইসব শিষ্যদের বলা হয় ধর্মান্তেবাষিক। এ ছাড়া থাকে আর এক জাতীয় শিষ্য, যারা বিত্তশালী অভিজাতবংশীয়, প্রথমেই আচার্যভাগ বা গুরুদক্ষিণা দিয়ে তারা চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়। এদের বলা হয় আচার্যভাগদায়ক শিষ্য। এদের শিক্ষার দিকেই গুরু স্বভাবত বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এ অবস্থায় তুমি এখন কী করবে?

দীর্ঘশ্বাস চেপে জীবক বললে,—আমাকে তাহলে ধর্মান্তেবাষিকই হতে হবে।

—কিন্তু ধর্মান্তেবাষিক শিষ্য হিসাবে আচার্য আত্রেয় তোমায় গ্রহণ করবেন কিনা সন্দেহ। দূর-দূরান্ত থেকে শত-শত শিষ্য আসে তাঁর কাছে শিক্ষা লাভের জন্য, যারা আচার্যভাগ দিতে সক্ষম। তবু অনেকে ভর্তি হতে পারে না। সে অবস্থায় কী করবে তুমি?

এ প্রশ্নের উত্তর জীবকের জানা নেই। সে চুপ করে থাকে। অজান্তে পড়ে দীর্ঘশ্বাস।

ছেলেটিকে সার্থবাহ বড় ভালোবেসে ফেলেছেন। তার অসহায় করুণ দীর্ঘশ্বাস তাঁকে বিচলিত করে তোলে। জীবকের পিঠে হাত রেখে মমতাভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,—নিরাশ হয়ো না, বাবা। আমি তো আছি। আচার্যভাগ দিয়ে আমিই তোমায় অধ্যাপক আত্রেয়ের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করার ব্যবস্থা করব। আত্রেয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়ও আছে।

সচকিত চোখে জীবক তাকায় সার্থবাহের দিকে, বলে—না, তা হতে পারে না।

কেন? কেন হতে পারে না?—সার্থবাহ হতভম্ব।

দৃঢ় কণ্ঠে জীবক বলে,—না, কারও দান আমি গ্রহণ করি না।

মুগ্ধ বিস্মিত মহাশ্রেষ্ঠী। মুখে তাঁর কথা জোগায় না। মনে আবার প্রশ্ন জাগে,—কে এই অসামান্য বালক? এই চারিত্রিক দৃঢ়তা, দানগ্রহণে এই অসম্মতি ও মর্যাদাবোধ, এ তো সামান্য অনাথ বালকের থাকার কথা নয়!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্নেহগভীর কণ্ঠে তিনি বললেন,—বাবা, জানিনে, কার ঘর শূন্য করে তুমি পথে বেরিয়েছ। কোন বর্ণে তোমার জন্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় না বৈশ্য—তাও জানা নেই। তুমি যে পরিচয় গোপন করেছ, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দিনে-দিনে তোমার যে পরিচয় লাভ করেছি, তা চিন্তারও অতীত, ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। বাবা, জীবনে আমি কম মানুষের সংস্পর্শে আসিনি, অভিজ্ঞতাও বড় কম লাভ করিনি। আজ মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, অনেক—অনেক বড় হবে তুমি। সমস্ত ভারতবর্ষ তোমার কীর্তিতে মুখরিত হবে। কিন্তু বাবা, আমার এই কাজকে তুমি দান বলছ কেন? বিনা অনুরোধে ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় নিয়ে তুমি যা আমাদের জন্যে করেছ, তার কৃতজ্ঞতা হিসাবে আমাদের কী কিছুই করণীয় নেই? তুমি না থাকলে আমাদের কী অবস্থা হতো, ভাবতেও শিউরে উঠি।

বলতে-বলতে তিরীট-বৎস তাকে বুকের কাছে টেনে নেন, বলেন,—বাবা, এ উপকারের কোনও প্রতিদান নেই। এ বৃদ্ধের স্নেহ-মমতার কথা যদি ছেড়েও দাও, কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য নিদর্শন হিসাবে আমার এ কাজটুকু তোমায় মেনে নিতেই হবে।

জীবক কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ। তুমুল ঝড় চলেছে মনের মধ্যে। শেষে ধীরে-ধীরে বললে,—বেশ, তাই হোক। যদি কোনওদিন পারি, স্বপার্জিত অর্থে আপনার এ ঋণ আমি শোধ করব।

বেশ তাই করো!—ক্ষুণ্ণ কণ্ঠ তিরীট-বৎসের।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে রাজগৃহে ফিরতে অভয়ের প্রায় এক মাস লাগল। ফিরে এসে দেখেন, সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে।

শোকে-দুঃখে তিনি স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে যান।

প্রধান ভৃত্য জানায়, জীবককে নিবৃত্ত করার জন্য তারা কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। যাওয়ার সময় কুমার তাদের বলে গেছেন, বাবাকে বলো, নিজের চেষ্টায় জীবনে যদি কোনওদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তবেই দেখা হবে, নয়তো নয়।

তারপর থেকে শুরু হয়েছে অভয়ের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন একটি মাত্র কাজ—জীবককে খুঁজে বের করার প্রাণান্ত চেষ্টা। নগরের পর নগর তোলপাড় হয়। মগধের ছোটবড় হেন নগর নেই, যা বাদ যায়। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল। কোথায় কোন দিকে সে গেছে, কেউ বলতে পারে না। নিশানা-নিদর্শন কিছুই রেখে যায়নি।

শোকে ভেঙে পড়েন অভয়। তাঁর শূন্য হৃদয় কাঁদে, হাহাকার করে। সেখানে কোনও সান্ত্বনা নেই, ভাষা নেই। আছে শুধু চিন্তা আর চিন্তা। সারাক্ষণ তিনি ভাবেন শুধু জীবকের কথা।

বিশাল নির্বান্ধব এই অজানা বিশ্বে একলা নিঃসম্বল সে কোথায় গেল? কোথায় হারিয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে, কে জানে!—অভয় যতই ভাবেন এসব কথা, শোকে-দুঃখে ততই তাঁর অবস্থা হয় পাগলের মতো। আহার-নিদ্রা প্রায় বন্ধ। কোথাও বেরোন না তিনি। কথা বলাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি ঘরে পায়চারি করছেন আর ভাবছেন জীবকের কথা। জীবকের স্মৃতিতে ভরে আছে তাঁর সারা অন্তর। ছোট-বড় কত অসংখ্য ঘটনা, কত মধুর সুখস্মৃতি! অভয় বুঝি চোখের জল রোধ করতে পারেন না।

এমনসময় প্রধান ভৃত্য এসে নতমস্তকে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। প্রভুর অবস্থা তাদের অজানা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু অভয়ের লক্ষ নেই তার দিকে। অন্যমনস্ক তিনি—গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন।

শেষে মৃদু কণ্ঠে ভৃত্যটি বললে,—প্রভু, দেবী শালবতী আজই একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

—কে?

অভয় থমকে দাঁড়ালেন,—কে? কী করেছেন?

তেমনি বিনীত কণ্ঠে ভৃত্য আবার বলে,—রাজনর্তকী দেবী শালবতী আপনাকে আজই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

কে? শালবতী?—অভয় চমকে উঠলেন, তাই তো! তাই তো! শালবতীর কথা তো মনেই ছিল না! যুদ্ধ থেকে ফিরে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখাই করিনি। ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো, আমি যাচ্ছি।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রায় তখুনি রওনা হলেন অভয়। মনে-মনে কেবলই বলছেন,—ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! বড্ড ভুল হয়ে গেছে!

কিছু পরে শালবতীর প্রাসাদে পৌঁছে তিনি হতভম্ব! কী ব্যাপার! বাড়ি অন্ধকার কেন? রাজনর্তকী শালবতী—এ সময় তার প্রাসাদ থাকে আলোয় আলোময়, নৃত্যগীতে মুখর। কোথায় তা! নিস্তব্ধ আঁধার বাড়ি কেন নিঝুম হয়ে আছে?

অভয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন।

প্রবেশ-পথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে শালবতীর প্রধানা দাসী, অভয়কে অভ্যর্থনা জানায়। অভয়ের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে,—মা অসুস্থ, তাই নাচগানের আসর বন্ধ। আপনি চলুন, মা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

অন্দরমহলে শালবতীর সুসজ্জিত কক্ষ। অভয় ঘরে ঢুকতেই শুয়ে ছিলেন শালবতী, উঠে বসলেন।

মানুষের যে এত রূপ থাকতে পারে, শালবতীকে না দেখলে বোধহয় কল্পনা করা যায় না। বিধাতা যেন ত্রিভুজের অতুল রূপমাধুরীর মধুরতম কণাগুলি নিয়ে আপন খুশিতে তিল-তিল করে গড়ে তুলেছেন অলৌকিক রূপের এই তিলোত্তমা। বয়স কত বলা কঠিন। যৌবনের ভরা নদী সৌন্দর্য প্রভায় টলমল করছে। মাথার কাজলকালো দীর্ঘ কেশরাশি আগোছালো, পিঠে ছড়িয়ে আছে সহস্র ফণা তুলে। পরনে সাধারণ একখানা কাপড়। গায়ে কোনও অলঙ্কার-আভরণ নেই। দুহাতে শুধু একগাছি করে কঙ্কণ। অপূর্ব দেবীমূর্তি যেন।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অভয় বললেন,—এ কী! তোমার স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? কী অসুখ? তাছাড়া এই বেশ, এই পরিবেশই বা কেন? যেমন বাড়ির অবস্থা, তেমনি তার কর্ত্রীর! কী হয়েছে?

বসুন। শরীর ভালো নেই কিছু দিন।—বীণার তারে যেন অপরূপ সুরের ঝঙ্কার উঠল, ম্লান হেসে শালবতী বললেন, —কিন্তু আপনার শরীরেরই বা এ অবস্থা কেন? কী হয়েছে আপনার? পূর্বাঞ্চল থেকে ফিরে শালবতীর কথা তো একবারও মনে পড়েনি? এ কী শুধু কাজের চাপ, না অন্য কিছু?

বলছি সে কথা।—বসতে-বসতে অভয় বললেন, কণ্ঠে উদ্বেগ,—কিন্তু কোনও চিকিৎসক দেখিয়েছ কি?

—হ্যাঁ। তাঁরা বলেছেন, শারীরিক অবসাদ থেকে এটা হয়েছে। বেশ কিছুকাল বিশ্রাম নিতে হবে। এবার বলুন, শুনি আপনার কথা।

অভয় নড়ে চড়ে বসলেন। কী যেন ভাবেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, —আচ্ছা, আমার পুত্র জীবকের কথা কী শুনেছ কখনও?

আ-প-না-র পু-ত্র! জী-ব-ক!—শালবতী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। টেনে-টেনে উচ্চারণ করলেন কথাগুলো।

ব্যস্তকণ্ঠে অভয় বললেন,—না, না, নিজের পুত্র বলতে যা বোঝায়, তা ঠিক নয়। বোধহয় পনেরো-ষোল বছর আগে এক ভোরবেলা ওকে আমি নিজেরই আমবাগানে এক বালিস্তূপের ওপর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। অনিন্দ্যসুন্দর এক সদ্যোজাত শিশু। অনেক চেষ্টা করেও ওর মা-বাবার সন্ধান পাইনি। সেই থেকে আমিই ওকে বুকে করে মানুষ করছি। একাধারে আমিই ওর বাবা-মা।

তারপর? আশ্চর্য ব্যাপার তো!—শালবতীর কণ্ঠে গভীর কৌতূহল। দুই আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি অভয়ের মুখের ওপর নিবদ্ধ।

ধীরে-ধীরে ম্লান মুখে অভয় একের পর এক খুলে বললেন সমস্ত ঘটনা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে যান তিনি জীবকের রূপ, স্বাস্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও শৌর্যবীর্যের নানা কাহিনি। বলতে-বলতে তাঁর গলা ধরে এল। শেষে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—সে চলে গেছে! জগতের সবার ওপর তার অভিমান। সবচেয়ে বেশি অভিমান বোধহয় আমার ওপর, নয়তো এভাবে চলে যাবে কেন? অভিমানী সন্তান, একবারও ভাবলে না, সে আমার কী ছিল! জগতে পিতৃমাতৃ পরিচয়ই কী সব? কী যে করব, কিছুই বুঝে পাচ্ছি না, শালবতী। আমার জীবনে সবই ফাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে। বৃথা এই বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা। সে কোথায় আছে, কী করছে, এ কথা যখন ভাবি, তখন কী যে মনের অবস্থা হয়, তা বলে বোঝাতে পারব না।

বলতে-বলতে অভয় চুপ করে যান। শালবতীও নীরব। অভয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। রাজনর্তকী হলেও তিনি নারী। রাজকুমার অভয়কে ঘিরেই এ তাবৎ কাল চলেছে তাঁর যত কিছু সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর কাউকেই তিনি জীবনে গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। অভয়ের ব্যথায় উদ্বেল তাঁর নারী হৃদয়। দুচোখে অশ্রু টলটল করছে।

অভয়ের জীবনেও শুধু দুটি মানুষ—জীবক ও শালবতী। এই দুই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে তাঁর কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা—তাঁর জীবনের সবকিছু। তার মধ্যে একটি কেন্দ্র আজ উধাও, আর তার ফলে তাঁর গোটা জীবনই এলোমেলো হয়ে গেছে।

নীরব কক্ষ। শোকবিহ্বল দুটি নরনারী মুখোমুখি বসে আছেন—কথা হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি।

শেষে একসময় চোখের জল মুছে শালবতী ধীরকণ্ঠে বললেন,—এখন মনে পড়ছে, অতীতে আপনার কাছে জীবকের কথা দু-একবার শুনেছি। এক শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা-ও শুনেছিলাম। অনেক কাল আগের কথা। তা পনেরো ষোলো বছর তো হবেই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন,—কিন্তু কুমার, আপনাকে এরকম বিচলিত হলে তো চলবে না। আপনার ধৈর্য, বুদ্ধি ও সাহস সকলের গর্বের বস্তু। এই বিপদে তা হারালে তো কোনও কিছুরই সুরাহা হবে না। ভেবে দেখুন, জীবকের খোঁজ পেতে হলে আমাদের ধীরে সুস্থে চিন্তা করে উপায় বের করতে হবে। আপনি জ্ঞানী, বীর। আমার মতো সামান্য নারীর আপনাকে উপদেশ দেবার দৃষ্টতা নেই। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আপনি মন শক্ত না করলে কোনও পথই পাওয়া যাবে না। আর তাতে ক্ষতি শুধু জীবকের বা আপনারই নয়, ক্ষতি এই অভাগিনীরও। দেব, ভুলবেন না, শালবতীর মতো অভাগিনী এ পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই।

অভয় নীবে বসে আছেন—যেন পাষাণ-মূর্তি। নত চোখের দৃষ্টি কক্ষতলে নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে শালবতী আবার বললেন,—দেব, ধৈর্য ধরুন। জীবকের কথা আপনার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, কোনও বিপদ-আপদ তাকে সহজে স্পর্শ করতে পারবে না। তার বুদ্ধিবিবেচনা ও বীরত্ব আর আপনার আশীর্বাদ তাকে সবসময় বর্মের মতো রক্ষা করবে। আমাদের আজ ভাবা দরকার, কী উদ্দেশ্যে কোথায় সে যেতে পারে। সে বলে গেছে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই তার লক্ষ্য। তা করতে

হলে আরও বিদ্যা তাকে অর্জন করতে হবে। এখন, বিদ্যা-চর্চার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র দুটি—বারাণসী ও তক্ষশিলা। তার মধ্যে তক্ষশিলা সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও অনেক দূরের পথ। তাই সর্বাগ্রে বারাণসীর চতুষ্পাঠীগুলিতে তার একবার সন্ধান নিলে ভালো হয়। আপনার মুখে এ পর্যন্ত যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, সে সন্ধান এখনও নেওয়া হয়নি।

অভয় ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছেন, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন শালবতীর দিকে। এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—ধন্য, ধন্য তোমার বুদ্ধি, শালবতী! ধন্য আমিও যে তোমার মতো নারী পেয়েছি জীবনে। শোকে-দুঃখে এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, এসব কথা একবারও মাথায় আসেনি। কালই বারাণসীতে লোক পাঠাব। তক্ষশিলায় পাঠাব কী?

লজ্জারক্ত আনত মুখে শালবতী বললেন,—আপনি আমায় ওভাবে বলবেন না, কুমার। আমার মনে হয়, বারাণসীতে আগে লোক যাক। তক্ষশিলার কথা পরে।

সেদিন রাতে শালবতীর গৃহে আহারাদি সেরে গভীর রাতে অভয় যখন বাড়ি ফিরলেন, তাঁর মন তখন অনেকটা শান্ত নিথর।

॥ দুই ॥

বণিকদলের সঙ্গে জীবক তক্ষশিলায় পৌঁছে গেছে। ছোটখাটো অসুবিধা ছাড়া পথে আর কোনও বিপদ ঘটেনি। একবার শুধু পথ ভুল হওয়ায় মরু কান্তারে তাদের জলকষ্টে ভুগতে হয়েছিল কয়েক দিন। তিরীট-বৎসের আনুকূল্যে আচার্যভাগদায়ক শিষ্য হিসাবে সে ভর্তিও হয়েছে অধ্যাপক আত্রেয়ের চতুষ্পাঠীতে।

তারপর থেকে বাবার চিন্তা জীবককে পেয়ে বসেছে। তার অদর্শনে বাবার কী অবস্থা হয়েছে, তা বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে।

মনশ্চক্ষে সে যেন দেখতে পায় : প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে ফিরে তাকে দেখতে না পেয়ে বাবার অবস্থা হয়েছে পাগলের মতো।

তাই সে যে তক্ষশিলায় নিরাপদে আছে এবং চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো করছে, এই সংবাদটা তাঁকে পাঠানো প্রয়োজন।

কিন্তু কীভাবে?—জীবক ছটফট করে দিনের পর দিন।

ইতিমধ্যে প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। বণিকদলের এবার ফিরে যাওয়ার পালা। তারই আয়োজনে ব্যস্ত তিরীট-বৎস।

যাত্রার ঠিক আগের দিন। শেষপর্যন্ত জীবক গেল তিরীট-বৎসের কাছে। বললে,—মহাশ্রেষ্ঠী, আপনাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এলাম। প্রার্থনা করি, আপনাদের যাত্রা শুভ ও নির্বিঘ্ন হোক। এ ছাড়া আপনার সঙ্গে একটু গোপন কথাও আছে।

তারপর তিরীট-বৎসকে একান্তে নিয়ে গিয়ে কুণ্ঠিত গলায় সে বললে,—মহাশ্রেষ্ঠী, প্রথমেই আপনার কাছে আমি করজোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করছি। আমি নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। রাজগৃহে আমার বাবা থাকেন। আমি যে তক্ষশিলায় নিরাপদে আছি ও চতুষ্পঠীতে ভর্তি হয়েছি, এই সংবাদটা তাঁকে অবিলম্বে দেওয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে দেব ভেবে পাচ্ছি না। তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। আপনি কি রাজগৃহে যাবেন?

তিরীট-বৎসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন,—তুমি যে অনাথ নও, তা আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম। বেশ, রাজগৃহে গিয়ে তোমার সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। কে তোমার বাবা?

—মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র রাজকুমার অভয়।

অ্যাঁ! ভয়ানক চমকে উঠলেন তিরীট-বৎস। বিহ্বল হতভম্ব তিনি—এত বড় ধাক্কার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এ কী কাণ্ড! বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে তিনি তাকিয়ে রইলেন জীবকের দিকে। শেষে ধীরে-ধীরে একসময় বললেন,—মহারাজ বিম্বিসারের পৌত্র তুমি! তা, এভাবে কেন গৃহত্যাগ করলে? পথের বিপদ-আপদ দুঃখকষ্টই শুধু নয়, শিক্ষালাভের গোটা ব্যাপারটাই তো অনিশ্চিত ছিল। অথচ এ সবের তো কোনও দরকার ছিল না!

মাথা হেঁট করে মৃদুকণ্ঠে জীবক বললে,—আমার প্রতিজ্ঞা, নিজের চেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। এতে বাবার সম্মতি থাকার কথা নয়। তাই বাধ্য হয়ে এই পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মাথা নাড়তে-নাড়তে তিরীট-বৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন,—বুঝেছি, বাবা, বুঝেছি। মনশ্চক্ষে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যৎ জীবনে কী বিপুল প্রতিষ্ঠা তুমি লাভ করেছ!

তেমনি হেঁট মাথায় জীবক বললে,—তাই আশীর্বাদ করুন, মহাভাগ। দয়া করে বাবাকে বলবেন, তিনি যেন আমার জন্য ব্যস্ত না হন। সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে আমি সংবাদ পাঠাব, যেমন বর্তমানে আপনার মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। তাঁকে আরও বললেন, তিনি যেন আমার জন্য এখানে কোনও লোক না পাঠান বা গন্ধাররাজের কাছে কোনও পত্র না দেন। ওটা কিন্তু আমাদের কারও পক্ষে শুভ হবে না।

॥ তিন ॥

রাজগৃহ! বারাণসী থেকে লোক ফিরে এসেছে। সমস্ত নগর ও চতুষ্পাঠী খুঁজেছে তারা। কিন্তু জীবকের কোনও সন্ধান নেই।

আবার দুশ্চিন্তা শুরু হয় অভয়ের। শালবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে তক্ষশিলায় লোক পাঠাবার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত তিনি, এমন সময় বণিকদল নিয়ে রাজগৃহে পৌঁছলেন তিরীট-বৎস।

অভয়ের প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে তিনি জানালেন জীবকের সংবাদ।

এত বড় আকস্মিক শুভ সংবাদে অভয়ের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তিরীট-বৎসের কাছ থেকে তিনি শুনলেন জীবকের সব সংবাদ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিরীট-বৎস বলে গেলেন জীবকের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের ক্ষণ থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে এবং জীবক যা যা বলেছে তার সবিস্তার কাহিনি।

শুনতে-শুনতে অভয় আনন্দে উদ্বেল—আত্মহারা।

তিরীট-বৎস ও বণিকদলের রাজসিক আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে তিনি ছুটলেন শালবতীর কাছে।

সমস্ত শুনে মৃদু হাসেন শালবতী, বলেন,—যাক, আপনি তাহলে নিশ্চিন্ত এত দিনে।

আর তুমি? তুমিও কি সুখী নও, শালবতী?—উচ্ছ্বাস অভয়ের কণ্ঠে। তাঁর মনে হচ্ছে, সমস্ত বিশ্বজগৎই আজ বুঝি আনন্দে মাতোয়ারা।

হ্যাঁ, আমিও।—মৃদু কণ্ঠে বলেন শালবতী, আপনার সুখেই আমার সুখ। আপনার দুঃখে আমারও দুঃখ। জীবক আপনার পুত্র আপনার স্নেহের ধন, তাই সে আমারও পুত্র আমার স্নেহের ধন...

বলতে-বলতে শেষ দিকে তাঁর গলা ধরে এল।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ এক ॥

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠীতে জীবক একাগ্র সাধনায় মগ্ন।

জীবকের মেধা, অধ্যবসায় ও আগ্রহ দেখে অধ্যাপক আত্রেয় চমৎকৃত। সুদীর্ঘ অধ্যাপক-জীবনে এমন অদ্ভুত প্রতিভাধর ছাত্র তিনি আর পাননি! অন্যের যা শিখতে সপ্তাহকাল লাগে, জীবক তা শেখে এক দিনে। মনের মতো ছাত্র পেলে শিক্ষকের যে মনের অবস্থা হয়, আত্রেয়েরও তাই। অনির্বচনীয় আনন্দে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে ধরেন জীবকের কাছে।

গুরুগৃহের অন্যান্য সকলেও বড় সুখী জীবককে পেয়ে। গুরুপত্নীর অগাধ স্নেহ জীবক পেয়েছে। তাঁকে সে ভক্তি করে মায়ের মতো। আচার্যের সংসারের নানা কাজ সে করে দেয় আর তা করে এত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে যে, সবাই অবাক হয়—যদিও আচার্যভাগদায়ক ছাত্র হিসাবে এসব তার করার কথা নয়। অন্যেরা তা করেও না। কিন্তু সে করে এবং করে কর্তব্যপরায়ণ সন্তানের মতো।

অবসর পেলেই সে তক্ষশিলার চারপাশের পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে ঘোরে, গাছপালা-মাটিপাথর নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় আর দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে নতুন-নতুন জ্ঞান অর্জন করে।

স্নানাহার ও রাত্রের ঘুমটুকু ছাড়া তার বিশ্রাম নেই।

এমনি করে বছরের পর বছর পার হয়।

রাজগৃহগামী কোনও পর্যটক বা বণিকদলের সাক্ষাৎ পেলে জীবক তাদের মাধ্যমে নিজের কুশলসংবাদ পাঠায় পিতা অভয়ের কাছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে দুটি বিভাগ ঃ এক, ভেষজ-চিকিৎসা, অর্থাৎ ঔষধের দ্বারা রোগ নিরাময় করা; দুই, শল্য-চিকিৎসা বা অস্ত্র-চিকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রোপচার

করে জীবের দেহের রুগ্ন অংশ নিরাময় করা। এই দুই বিভাগে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করতে হলে খুব কম করেও চোদ্দো বছর সময় লাগে।

কিন্তু ছয় বৎসর যেতে না যেতেই দেখা গেল, ভেষজ-চিকিৎসায় যা কিছু জ্ঞাতব্য, তার কিছুই আর জীবকের অজানা নেই। বরং প্রচলিত জ্ঞানের বাইরেও সে আপন প্রতিভাবলে জেনেছে ও উদ্ভাবন করেছে অনেক কিছু। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাই। দু-চারটি বিষয় ছাড়া কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই। এমন কি শল্য-চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য কয়েকটি সূক্ষ্ম নতুন অস্ত্রও সে উদ্ভাবন করেছে।

আর তার ফলে লোকচক্ষুর অন্তরালে শুরু হয়েছে বিচিত্র এক নাটক। এবং ক্রমেই তা এগিয়ে চলেছে শেষ অঙ্কের দিকে।

জীবকের অভাবনীয় মেধা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা দেখে চতুষ্পাঠীর অন্য ছাত্ররা প্রথমে দারুণ চমকে গিয়েছিল। এত বড় একটা ব্যাপার, যা কোনও দিন ঘটেনি, তা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। তাই তাদের মধ্যে জেগেছিল বিপুল বিস্ময় ও চাঞ্চল্য।

কিন্তু ধীরে-ধীরে, যত দিন গেছে, জীবকের অদ্ভুত ক্ষমতার প্রমাণ তারা পেয়েছে অসংখ্যবার, তাই শেষপর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছে রূঢ় বাস্তব সত্যকে, মেনে নিয়েছে জীবকের শ্রেষ্ঠত্ব।

কিন্তু মানতে পারেনি ছাত্রদের ছোট একটি দল। জীবকের বিরুদ্ধে তাদের মনে জ্বলেছে ঈর্ষার আগুন। সময়ের সঙ্গে সে আগুন নেভা তো দূরের কথা, বরং বেড়েই চলেছে।

কারণ চতুষ্পাঠীতে তারা ভর্তি হয়েছিল জীবকের অনেক আগে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই ছেলেটা কিনা তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। তারাও কী কম চেষ্টা করেছে এগিয়ে যাওয়ার! কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। শেষ পর্যন্ত ওর নাগাল পাওয়ার আর তা না হলে পিছু-পিছু ছোটার চেষ্টাও তারা করেছিল। কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। ছেলেটা এত তাড়াতাড়ি এত দূর এগিয়ে গেল যে, নাগাল পাওয়া দূরের কথা, তারা ওর কাছাকাছিও যেতে পারল না। সমস্তটাই এমন অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার যে, তাদের কল্পনার বাইরে।

এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে তাদের কম আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়নি। শেষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে তারা একমত হয়েছে। তা হল, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু কী সেটা?

হিংসার আগুনে পুড়তে-পুড়তে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের ছোট এই দলটি সেই রহস্য-ভেদের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

এই গেল একটা দিক। ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের এই ঘাত-প্রতিঘাত তখন চলেছে বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে, তখন কিন্তু নাটকের আর একটা অঙ্কের অভিনয় চলেছে অন্যত্র এবং অতি সংগোপনে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, তা রূঢ় সত্য এবং জীবকের দিক থেকে সাংঘাতিকও বটে।

এই অঙ্কের মূল অভিনেতা অন্য কেউ নন—আচার্য আত্রেয় স্বয়ং!

ছাত্রদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, অবাঞ্ছিত হলেও, অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আত্রেয়ের মনেও যে প্রায় সেই একইরকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল!

জীবকের মেধা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা দেখে আচার্য প্রথম দিকে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই।

আয়ুর্বেদের আদ্য পাঠ্যগুলির প্রত্যেকটি আয়ত্ত করতে সাধারণভাবে কমপক্ষে চোদ্দো-পনেরো দিন সময় লাগার কথা। কিন্তু তা যখন জীবক দু-এক দিনেই আয়ত্ত করতে থাকে, আত্রেয় তখন একটু চমকে উঠলেও, তাঁর মানসিক ভারসাম্য বা শান্তিতে কোনও আঘাত ঘটেনি। সুদীর্ঘ কালের তাঁর যা অভিজ্ঞতা, তাতে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, মেধা ও প্রতিভা যতই থাক, জটিল ও কঠিন বিষয়ে এসে জীবকের গতি মন্থর হবেই!

কিন্তু কী কাণ্ড! তাঁর চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা সবই কিনা এই ছাত্রটির ক্ষেত্রে এসে মিথ্যা প্রমাণিত হল! তাই অন্য ছাত্রদের মতো তিনিও বেশ একটু চমকে উঠেছিলেন।

তারপর যত দিন গেছে, আত্রেয়ের মনে ততই ধীরে-ধীরে দানা বেঁধেছে এক অস্বস্তি।

তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যাপনা-জীবনে ছাত্রদের মধ্যে কিছু-না-কিছু বিস্ময়কর প্রতিভা ও মেধার সাক্ষাৎ যে তিনি পাননি তা নয়, কিন্তু জীবকের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি উপাদান, তা হল অধ্যবসায়। ছাত্রটি যেন জ্ঞান-তপস্বী—জ্ঞানের সাধনায় অবিচল, আর কোনওদিকে তার লক্ষ নেই। অসামান্য মেধা ও প্রতিভার সঙ্গে অনন্যসাধারণ অধ্যবয়সের সমন্বয়—এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ, যা কদাচিৎ নজরে পড়ে। আর তার ফলে, যে কোনও বিষয় হোক আর তা যত জটিল ও কঠিনই হোক না কেন, অসাধ্যসাধক ক্ষণজন্মা ছাত্রটির তা গতিরোধ করতে পারে না। জ্ঞানরাজ্যে তার বিচরণ শুধু অবাধ, স্বচ্ছন্দ ও অপ্রতিহতই নয়, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা সে-জ্ঞানকে সে কিনা ইতিমধ্যে সমৃদ্ধতরও করেছে!

তাই অস্বস্তি থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আচার্যের মনে ধীরে-ধীরে

দেখা দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। কী তাঁর করণীয়? কোন পথে যাবেন তিনি?—অনেক ভেবেছেন আত্রেয় আর ছটফট করেছেন।

যত দিন গেছে, তিনি বুঝেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সম্মান নির্দিষ্ট হয়ে আছে জীবকের জন্য। শেষ পর্যন্ত এটাকে তিনি মেনে নিয়েছেন অবধারিত ধ্রুব সত্য বলে। আর না মানলেই বা শুনছে কে! নিজের মনকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের গুরু হিসাবে তিনি পরবর্তীকালে গর্ব ও গৌরব বোধ করতে পারবেন, ইতিহাসে তাঁর নামও অক্ষয় হয়ে থাকবে জীবকের সঙ্গে।

কিন্তু এখন যা তাঁকে সবচেয়ে অস্থির ব্যাকুল করে তুলেছে, তা হল নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। জীবক যদি তক্ষশিলায় অধ্যাপনা ও চিকিৎসা-বৃত্তি শুরু করে, তাহলে! তাহলে কী হবে? আত্রেয় মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পান, তাহলে তাঁর রাজবৈদ্যের পদ যাবে, চিকিৎসক ও অধ্যাপক হিসাবে মানসম্মান উপার্জন কিছুই থাকবে না। সংসার প্রতিপালনের জন্য কী করে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন তিনি?

তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে আত্রেয় আজ ক্ষতবিক্ষত। একদিকে অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রের প্রতি তাঁর কর্তব্য, অন্য দিকে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিষম দুশ্চিন্তার বোঝা,—তাঁর মনে চলেছে এই টানাপোড়েনের ঘাত-প্রতিঘাত। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জীবককে আজ তিনি যেন কিছুতেই আর ছাত্র হিসাবে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না, তাকে প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে।

নিজের এই অবস্থা কাউকে বলে যে তিনি একটু ভারমুক্ত হবেন বা এ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে পরামর্শ করবেন, তারও উপায় নেই। এমনকী নিজের স্ত্রীকেও বলা চলে না। তাহলে তাঁর চোখে যে তিনি অনেক ছোট হয়ে যাবেন। নিজের স্ত্রীকে তিনি তো চেনেন!

আচার্যের এই অস্থিরতা কিন্তু তাঁর সহধর্মিনীর কাছে চাপা থাকে না। অত্যন্ত অবাক হন তিনি। কোথায় গেল স্বামীর চিত্তের সেই প্রশান্তি, সেই প্রাণখোলা উদারতা! তার বদলে তাঁর মেজাজ আজ সবসময় রুক্ষ, খিটখিটে —কারণে অকারণে অতি অল্পেই রেগে ওঠেন তিনি। কেন? কী কারণ? কেন এমন হল? আচার্যপত্নীর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। সংসারে তো কোনও অভাব নেই। কোনও অশান্তিও তো ছিল না—অল্পে সন্তুষ্ট তাঁদের জীবন। তবে— তবে কেন স্বামীর এই অবস্থা? শয়নে স্বপনে জাগরণে এক মুহূর্ত স্বস্তি বা শান্তি নেই তাঁর।

আচার্য পত্নী শেষে নিরুপায় হয়ে এর কারণ জিগ্যেস করেন স্বামীকে। আচার্য চমকে ওঠেন প্রশ্ন শুনে। প্রথম দিকে তাঁর মুখে কথা জোগায় না। শেষে স্ত্রীর সঙ্গে শুরু হয় তাঁর লুকোচুরি খেলা। দিনের পর দিন নানা কৌশলে তিনি এড়িয়ে যান প্রশ্নটা।

আচার্য-পত্নী বোঝেন, গুরুতর কোনও ব্যাপার স্বামী লুকোচ্ছেন তাঁর কাছ থেকে। আকাশ-পাতাল ভাবেন তিনি। কী এমন গোপন ঘটনা স্বামীর জীবনে সহসা ঘটতে পারে, যা স্ত্রীর কাছেও ব্যক্ত করা চলে না? কোনও সদুত্তর খুঁজে পান না তিনি। ধীরে-ধীরে তাঁর মনে নানা সন্দেহের ছায়াপাত হয়। দিনে-দিনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠে সন্দেহের এক কালো প্রাচীর। কোথায় উবে যায় সংসারের সেই অনাবিল সুখ-শান্তি!

আত্রেয় বুঝতে পারেন সবই। শোচনীয় অসহায় অবস্থা তাঁর। মনে-মনে হায়-হায় করেন তিনি আর নিষ্কৃতির পথ খোঁজেন।

শেষ পর্যন্ত মিলল বুঝি সেই পথ। নিজের মনের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে-ও আপস করেন আত্রেয়। নিজের ভবিষ্যতের প্রশ্নই তখন তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি স্থির করলেন, শল্য-চিকিৎসার কিছু-কিছু অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয় তিনি গোপন রাখবেন জীবকের কাছে। তার মধ্যে কপালমোচনী বিদ্যা সর্বপ্রধান। এ বিদ্যা জানা থাকলে, তবেই জীবের করোটি বা মাথার খুলি উন্মুক্ত করা যায়। মস্তিষ্কের রোগে শল্য-চিকিৎসার দরকার হলে অর্থাৎ করোটি খুলতে হলে, এ বিদ্যা জানা না থাকলে কিছুই করা যাবে না। এমনি আরও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যা তিনি শেখাবেন না জীবককে, অব্যাখ্যাত রাখবেন তার কাছে।

নিজের মনকে প্রবোধ দেন আত্রেয়, এর দ্বারা এমন কিছু অন্যায় তিনি করছেন না। কোনও বিদ্যাকে ছাত্রের কাছে অব্যাখ্যাত রাখার নামই তো 'আচার্যমুষ্টি'। অধ্যাপকরা অনেক সময় কোনও-কোনও শিক্ষণীয় বিষয়কে আচার্যমুষ্টি হিসাবে রক্ষা করে থাকেন। এ ধারা চলে আসছে চিরকাল। তাই তো 'আচার্যমুষ্টি' কথাটার এত প্রচলন! আর তিনি আত্রেয় সেই ধারাই শুধু অনুসরণ করছেন কয়েকটি মাত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে। এটা এমন কিছু অন্যায় ব্যাপার নয়।

এমনি করে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চান আত্রেয়। চেষ্টা করেন গোঁজামিল দেওয়ার। কিন্তু কই, মনের সে শান্তি তো ফিরে আসে না! কোথায় যেন তা মিলিয়ে গেছে আলেয়ার মতো।

এদিকে আচার্য যখন নিজের মনের সঙ্গে এই বোঝাপড়ায় ব্যস্ত, তখন জীবকের জীবনে নামছে নৈরাশ্যের কালো অন্ধকার। অতি দ্রুত সে অন্ধকার গ্রাস করছে তাকে।

তীক্ষ্ণধী জীবকের শাণিত দৃষ্টির কাছে আচার্যের ভাবান্তর গোপন থাকেনি। সে দেখেছে, দিনে-দিনে আচার্য কেমন যেন বিষণ্ণ উন্মনা হয়ে পড়ছেন। প্রথম দিকে সে ভেবেছিল, এর পেছনে হয়তো কোনও বৈষয়িক বা পারিবারিক কারণ আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে সে দারুণ হকচকিয়ে গেল, যখন দেখল, আচার্য তাকে যেন সব সময় এড়িয়ে চলতে চান, তার শিক্ষার প্রতিও তিনি উদাসীন।

জীবক হতভম্ব! কেন? কেন? কেন?—আকাশ পাতাল ভাবে সে। তার প্রতি গুরুদেবের স্নেহ-মমতার অফুরন্ত ধারা কেন দিনে-দিনে শুকিয়ে আসছে? জন্ম-অভাগা সে। যে দিন সে প্রথম পৃথিবীর বুকে চোখ মেলেছিল, সে দিন থেকেই দুর্ভাগ্য তার সঙ্গের সাথী। তাই হয়তো নিজের অজ্ঞাতে এমন কোনও গুরুতর অপরাধ সে করে ফেলেছে, যার জন্যে পিতৃপ্রতিম আচার্য তার প্রতি আজ বিদ্রূপ ও অসন্তুষ্ট।

জীবক ভেবে পায় না, কী করলে আচার্য তার প্রতি আবার খুশি হবেন। সর্বক্ষণ কত ভাবেই না সে চেষ্টা করে চলে তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যে!

কিন্তু বৃথাই সব। নিজের ছাত্র-জীবনের চরম আঘাত তখনও বাকি আছে তার জন্যে। সে আঘাত যখন এল, সে ভেঙে পড়ল একেবারে। হঠাৎ সে একদিন আবিষ্কার করল, শল্য-চিকিৎসার কয়েকটি জটিল বিষয়, বিশেষত কপালমোচনী বিদ্যা আচার্য তাকে কোনওমতেই শেখাতে প্রস্তুত নন।

স্তব্ধ বজ্রাহত জীবক। জীবনের সবকিছুই আবার তার এলোমেলো হয়ে যায়। কয়েক দিন কাটে আচ্ছন্নের মতো। পথে-পথে সে ঘোরে—উদ্‌ভ্রান্ত যেন, যেন দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে চলেছে। নির্বান্ধব দেশে কোথাও কেউ নেই তাকে পরামর্শ দেওয়ার, কেউ নেই সাহায্য করবার।

সেদিন অন্ধকার গভীর রাত্রি। আবার চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে জীবকের জীবনে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে। কী করবে? অপূর্ণ বিদ্যা নিয়ে কোথায় যাবে। কোথায় কীভাবে পূরণ করবে সে অসমাপ্ত জ্ঞান? অন্ধকারে ঢাকা জন্ম পরিচয়হীন জীবন। ভেবেছিল, নিজের চেষ্টায় ও পুরুষকারের সাহায্যে বিশ্বসংসারে মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু...কিন্তু তা-ও হল না...কেন?...কেন?... কেন?...কী তার অপরাধ?...

অসহ্য ব্যথায় জীবকের চোখে নামে জলের ধারা। হতাশা যেন সহস্র ফণা তুলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে তাকে। নাঃ, কালই সে চলে যাবে কোথাও—যে দিকে দুচোখ যায়।...কিন্তু তারই বা কী দরকার! কী দরকার এই ব্যর্থ অন্ধকার জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানোর! অনর্থক! অকারণ! হ্যাঁ, সেই ভালো...

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো তার মনে ঝিলিক দিয়ে গেল আর একদিনের আর একটা ঘটনা। সে দিনও ছিল এমনি গভীর রাত্রি—এমনি নৈরাশ্যের আঁধারে ঢাকা...সে দিনই তো...হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই দিনই সেই গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে জীবনে সে পেয়েছিল শ্বেতশুভ্র কাষ্ঠফলকে রক্তাক্ষরে লেখা সেই অভয় মন্ত্র। যেন তারই হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লেখা!

সচকিত জীবক সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, নিজের ছোট্ট ঝোলার ভেতর থেকে নিয়ে আসে অতি যত্নে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো সেই কাঠের ফলকটা। এ যেন তার জীবনের সবচেয়ে আদরের ধন—তার অমূল্য সঞ্চয়, একমাত্র আশ্রয়। একে কী সে অযত্নে রাখতে পারে!

আলোর শিখায় ঝকঝক করে ওঠে রক্তাক্ষর ঃ

পুত্র!

অস্থির হয়ো না, পথভ্রষ্ট হয়ো না। মহৎ কর্মেই মানুষের পরিচয়। ভবিষ্যৎ জীবনে কত বাধা-বিপত্তি আসতে পারে। তাতে বিচলিত হয়ো না, অধীর হয়ো না। জীবসেবার ব্রত নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাও। আশীর্বাদ করছি পুত্র, জীবনে তুমি উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করবে। ফলকখানা সাবধানে রক্ষা কর। ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন হতে পারে।

পড়তে-পড়তে জীবকের চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে। আবার চোখে নামে অশ্রুধারা ঃ এই তো আজই আবার প্রয়োজন হল! মা...হ্যাঁ, মা...নিশ্চয়ই মা...মা ছাড়া এমন স্নেহ আর কার হবে? মা, মাগো, আবার তুমি আমায় পথ দেখালে। আবার রক্ষা করলে পুত্রের জীবন।

ফলকটা জীবক বুকে চেপে ধরে চোখ বুঝল। ধীরে-ধীরে আবার ফিরে আসে তার সেই চিন্তার ঋজুতা ও স্বচ্ছতা। না আর অস্থিরতা নয়। বাধা-বিপত্তি যতই আসুক, সে আর অধীর হবে না। কালই সে কথা বলবে গুরুদেবের সঙ্গে, খোলাখুলি আলোচনা করবে। তাতে ফল না হয়, সে যাবে অন্য কোথাও—আর কোনও গুরুর কাছে। অভাগিনী স্নেহময়ী জননীর আশীর্বাদ সে সফল করবেই।

॥ দুই ॥

পরদিন। ভোর বেলা।

আত্রেয় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। পূব গগনে ঊষার আলোর আভাস। উঁচু এক পাহাড়ি ভূমির ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

মলিন মুখ—অন্যমনস্ক তিনি। যে পথকে তিনি সারা জীবন অশ্রদ্ধেয় অসঙ্গত বলে পরিহাস করে এসেছেন, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সেই পথ সেই 'আচার্যমুষ্টি' প্রথাকে আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে. মন যেন কিছুতেই তা মানতে চাইছে না।

তাই স্বস্তি নেই তাঁর। শান্তিও নেই। শান্তি নেই তাঁর সংসারেও। অপরের চোখেই শুধু নয়, নিজের কাছেও বড়-ছোট, বড়-অপরাধী মনে হয় তাঁর নিজেকে।

আত্রেয়ের মন তাই অস্থির চঞ্চল। বিষণ্ণ চোখে তিনি তাকিয়ে থাকেন পূব দিগন্ত পানে।

হঠাৎ পেছনে শোনা যায় মৃদুকণ্ঠ,—গুরুদেব!

আত্রেয় চমকে ফিরে তাকান,—কে? জীবক! তুমি?

আচার্যকে প্রণাম করে জীবক নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও কথা বলে না।

কিছু বলবে?—আত্রেয় জিগ্যেস করেন।

মৃদুকণ্ঠে জীবক বলে,—গুরুদেব, কিছুকাল যাবত আমি মানসিক যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছি।

—মানসিক যন্ত্রণা! কেন, কী হয়েছে?

তেমনি বিনীত কণ্ঠে জীবক বললে,—গুরুদেব, আপনি আমার পিতৃপ্রতিম। পিতার মতোই মনে-প্রাণে আপনাকে ভক্তি করি। সন্তান যদি অজ্ঞানে পিতার কাছে কোনও অপবাধ করে, তার কি ক্ষমা নেই?

বলতে-বলতে সে হাঁটু গেড়ে বসে আচার্যের দুই পা জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল পায়ের ওপর।

আত্রেয় বড় বিচলিত বোধ করেন,—তবে কী? তবে কী—

নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় তাঁর। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন,—ওঠো বাবা, ওঠো!

কিন্তু পরক্ষণে তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—এ কী? এ কী! তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে, খুলে বলো। কোনও দোষই তো তুমি করোনি। ওঠো বাবা, ওঠো।

করিনি? দোষ করিনি?—উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সজল চোখে জীবক সবিস্ময়ে বললে,—তাহলে গুরুদেব, আমার শিক্ষার প্রতি বর্তমানে আপনি উদাসীন কেন? শল্য-চিকিৎসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় বিশেষত কপালমোচনী বিদ্যা কেন আমায় শেখাচ্ছেন না? আপনার স্নেহাস্পদ পুত্রের শিক্ষা অসমাপ্ত থাক, এ তো আপনি অকারণে চাইতে পারেন না।

জীবকের কাছে হঠাৎ এভাবে ধরা পড়ে যাবেন, আত্রেয় বোধহয় তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। মুখে কথা নেই। পাষাণ-মূর্তি যেন। কিন্তু মনে চলেছে দারুণ ঝড়।

শেষে ধীরে-ধীরে তিনি তাকালেন জীবকের দিকে। প্রথম অরুণোদয়ের রক্তিমচ্ছটা এসে পড়েছে জীবকের মুখে। শুষ্ক মলিন মুখ। উস্কোখুস্কো চুল। ক্লান্তি ও অন্তর্যাতনার ছাপ স্পষ্ট। আত্রেয় যেন আজ প্রভাতে নতুন করে দেখলেন জীবককে—চোখ ফেরাতে পারেন না। সুগঠিত বলিষ্ঠ কী অপূর্ব প্রতিভাদীপ্ত রূপ! নিষ্পাপ সরল তারুণ্যের দীপ্ত আলোক-শিখা যেন।

আত্রেয়ের হঠাৎ কী হল, কে জানে! মনের এই গুরুভার, এই অশান্তি আর বুঝি তিনি সহ্য করতে পারছেন না। আজ এই বসন্ত-প্রভাতের প্রথম আলোয় জীবকের কাছে তাঁর নিজেকে বড়-ছোট, বড়-হীন মনে হল।

জীবককে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন,—বাবা, অপরাধী তুমি নও, অপরাধী আমি। গুরুতর অপরাধ করেছি। আজ তোমার কাছে অকপটে সে অপরাধ স্বীকার করে নিজের মনের পাপ লাঘব করব।

বলতে-বলতে আত্রেয়ের গণ্ড বেয়ে নামে তপ্ত অশ্রুধারা। তারপর সেখানে বসে ধীরে-ধীরে তিনি বিস্ময়বিমূঢ় জীবকের কাছে খুলে ধরেন তাঁর মনের কপাট।

বেশ কিছুক্ষণ জীবক কথা বলতে পারে না। এত বড় বিস্ময়ের জন্য সে তো এতটুকুও প্রস্তুত ছিল না! তাই বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। শেষে গুরুদেবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পা ছুঁয়ে আবেগরুদ্ধ গলায় সে বললে,—গুরুদেব, আজ এই প্রভাতে সূর্য সাক্ষী করে আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আমি কোনওদিন অধ্যাপনা করব না। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলেই গন্ধাররাজ্য ত্যাগ করব। তার মধ্যে যদি কোনও রোগীর চিকিৎসা করতে বাধ্য হই, আপনার অনুমতি ছাড়া করব না। আর গুরুদেব, গন্ধারে কোনও রোগীর চিকিৎসা করতে হলে, তার সমস্ত পারিশ্রমিক আপনার চরণে নিবেদন করব গুরুদক্ষিণা হিসাবে।

না! না! না, পুত্র!—আর্তকণ্ঠে বললেন আত্রেয়,—তোমার প্রতিজ্ঞা

ফিরিয়ে নাও। আমার অবশিষ্ট জ্ঞানভান্ডার তোমায় উজাড় করে দিয়ে আমি পাপমুক্ত হব, বেঁচে থাকব তোমার মধ্যে। আমিই অপরাধী জীবক, আমিই অপরাধী! আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়িও না, পুত্র!

॥ তিন ॥

জীবকের শিক্ষা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ওই ঘটনার পর থেকে।

আত্রেয়ের জীবনে আবার সেই প্রশান্তি ফিরে এসেছে। শান্তি এসেছে সংসারেও। পত্নীকে সব কথাই খুলে বলেছেন আত্রেয়।

মনপ্রাণ ঢেলে তিনি অবশিষ্ট বিদ্যা দান করছেন জীবককে। কপালমোচনী বিদ্যা সমেত শল্য-চিকিৎসার কোনও বিষয়ই আর বাদ থাকছে না।

কিন্তু কয়েকটি অভাগা ছাত্রের জন্যে তা কী নিশ্চিন্তে করার উপায় আছে! নতুন করে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে চতুষ্পাঠীতে। এর পেছনে আছে সেই পুরোনো ছাত্র কয়টি। গোপনে তাদের রটনা চলেছে অন্য সব ছাত্রের মধ্যে, —দেখছো ভাই, গুরুদেবের আচরণ—তাঁর কাজকর্ম ও মনোভাব কীরকম পক্ষপাতদুষ্ট! অখণ্ড মনোযোগ ও স্নেহমমতা তাঁর জীবকের দিকেই। আর তার ফলে আমাদের কিনা বিনা দোষে সমূহ ক্ষতিস্বীকার করতে হচ্ছে।

এই সঙ্গে জীবকের বিরুদ্ধে তাদের সেই চিরাচরিত কুৎসা রটনা তো আছেই। সেসব অবশ্য জীবকের গা সহা হয়ে গেছে। কিন্তু ইদানিং কুৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি ব্যাপার। সেটা হল পেছন ও আড়াল থেকে তাকে লক্ষ করে বিদ্রূপ ও কটূক্তি বর্ষণ। কিন্তু সেসবও ও গায়ে মাখে না। মাখবেই বা কেন? সে তো আর এত নির্বোধ নয় যে, সতীর্থ বন্ধুদের এই ঈর্ষা-দ্বেষের কারণ বুঝতে পারবে না। তাই অতীতের মতো এখনও সে বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে যায় আর সতীর্থদের ক্ষুদ্রতায় কষ্ট পায় মনে-মনে।

কিন্তু তা বলে কুৎসা-রটনা ও প্ররোচনা তো আর বন্ধ থাকতে পারে না! দিনের পর দিন তা একতরফা চলে সমানে। আর তার ফলে বেশ কিছু ছাত্রের মন বিষিয়ে উঠতে থাকে একটু-একটু করে।

ব্যাপার দেখে আত্রেয় শেষ পর্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি যেভাবে ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠছে, তাতে এখনই কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা দরকার।

বয়োজ্যেষ্ঠ অভাগা ছাত্র কয়টির মনে জীবক সম্বন্ধে যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ আছে, তা তাঁর অজানা নয়। এটা তাদের অক্ষমতারই ফল। কিন্তু এটা দূর

করার কোনও চেষ্টা অতীতে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। কারণ জীবক সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনই তখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কিন্তু বর্তমানে দিনে-দিনে চতুষ্পাঠীর অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ব্যাপারটাকে আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা চলে না।

উপায় ভাবতে থাকেন আত্রেয়। এমন সময় সেদিন এক অবস্থাপন্ন রোগীর বাড়ি থেকে তাঁর ডাক এল। কী ভেবে তিনি জীবক ও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিয়ে গেলেন রোগী দেখতে। এটা তাঁর শিক্ষাদানের একটা অঙ্গ। ছাত্রেরা যাতে হাতে-কলমে শিক্ষা পায়, তার জন্যে রোগী দেখার সময় তাদের সঙ্গে রোগ ও ওষুধ-সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে আলোচনা করেন তিনি। তারপর রোগীকে যে ব্যবস্থাপত্র দেন, ছাত্রেরা সেটা নকল করে নেয়।

সেদিনও তাই করলেন আচার্য আত্রেয়। কিন্তু এবার বিশেষভাবে সঙ্গে নিলেন জীবককে ও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন, রোগ খুব কঠিন নয়। তিনি ব্যবস্থাপত্র দিলেন। অন্য সব ছাত্রেরা তা বিনা প্রশ্নে নির্বিবাদে নকল করে নিল।

কিন্তু চমকে উঠলো জীবক,—এ কী ব্যবস্থাপত্র দিলেন গুরুদেব! এ ওষুধ ব্যবহার করলে রোগের উপশম হওয়া তো দূরের কথা, রোগ যে আরও কঠিন হয়ে পড়বে! এমনকী রোগীর জীবনও বিপন্ন হতে পারে। সাধারণ একটা রোগের নিদান বের করতে এত বড় ভুল করলেন গুরুদেব!

শিষ্যদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আত্রেয় রোগীকে একটা ওষুধ খেতে দিয়ে বললেন,—আজ আর কোনও ওষুধ নয়। আগামীকাল প্রাতঃকালে অর্ধপ্রহর অতীত হবার পর থেকে এই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করা আরম্ভ করবেন।

জীবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

সেই দিনই দুপুর নাগাদ সে আবার এসে হাজির হল রোগীর বাড়িতে। তার মনে তখন আর কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। নতুন আর একটা ব্যবস্থাপত্র সে তৈরি করে এনেছে। রোগীকে সেটা দিয়ে সে বললে,—দেখুন, গুরুদেব আমাকে এই নতুন ব্যবস্থাপত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং এটাই ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন আজ বিকেল থেকে। পুরোনো ব্যবস্থাপত্রটা বাতিল বলে গণ্য হবে।

পরদিন প্রত্যুষে আবার রোগী দেখতে বের হন আত্রেয়। গতকাল যেসব ছাত্র সঙ্গে ছিল, আজও তাদের সঙ্গে নিয়েছেন।

গতকালের রোগীর বাড়িতেই তিনি গেলেন সর্বপ্রথম। রোগীকে জিগ্যেস করলেন,—কেমন বোধ করছেন? ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছেন তো?

জীবক নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। আর অন্য ছাত্রদের
চোখেমুখে বিক্ষোভের স্পষ্ট চিহ্ন।.. তিনি ..বললেন

হ্যাঁ।—মৃদু হেসে রোগী বললে,—অনেক ভালো বোধ করছি। মনে হয়, আজকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাব। গতকাল দুপুরে জীবকের হাত দিয়ে আপনি যে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র পাঠিয়েছিলেন, তদনুযায়ী গতকাল বিকেল থেকেই নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করছি।

কথাটা শুনতেই স্তম্ভিত হয়ে যায় অন্য ছাত্ররা—একমাত্র জীবক ছাড়া। তাদের চোখে-চোখে কী যেন কথা হয়।

আচার্যের মুখে কিন্তু মৃদু হাসি। বললেন,—হুঁ, ব্যবস্থাপত্র দুটো আনুন তো!

জীবকের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র দেখে আচার্য যেমন বিস্মিত, তেমনি চমৎকৃতও বটে। গর্বে ও আনন্দে তাঁর বুক ভরে ওঠে। এমন ব্যবস্থাপত্র তিনিও দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আত্রেয় তাকালেন জীবকের দিকে, তাকালেন অন্যদের দিকে।

জীবক নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। আর অন্য ছাত্রদের চোখে-মুখে বিক্ষোভের স্পষ্ট চিহ্ন। তাদের তিনি বললেন,—নতুন এ ব্যবস্থপত্রটা দেখার সুযোগ তোমরা পাওনি। এটা দেখে নাও।

বাড়ি ফিরে সমস্ত ছাত্রদের ডাকলেন তিনি। দুরু-দুরু বুকে জীবকও উপস্থিত। এবার বোধহয় তার বিচার হবে। অন্যায় সে করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ ছাড়া তার আর কী-ই বা করার ছিল।

নতুন রোগীর বাড়িতে গতকাল ও আজ যা-যা ঘটেছে, অন্য ছাত্রেরা তার কিছুই জানে না। তাদের কাছে ঘটনার মোটামুটি বিবরণ দিয়ে আত্রেয় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বললেন,—এ সম্বন্ধে মনে হয় তোমাদের কিছু বলবার আছে। যদি থাকে তো বলতে পারো।

এতদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও অভিযোগ আজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নেতা সঙ্গে-সঙ্গে রাগে ফেটে পড়ল,—গুরুদেব, জীবকের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব আমরা পূর্বাপর দেখে আসছি। এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমরা মনে করি। আমাদের বরাবর সন্দেহ ছিল, জীবককে আপনি গোপনে আমাদের অনুপস্থিতিকালে অনেক নতুন-নতুন বিষয়ে শিক্ষা দেন। আমাদের সেই সন্দেহ যে সত্য, এই ব্যবস্থাপত্রের ব্যাপারে তা আজ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অস্বীকার করার কোনও পথই খোলা নেই।

ছাত্রটির দুর্বিনীত কণ্ঠ ও ঔদ্ধত্য দেখে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন আত্রেয়। কিন্তু সংযম হারালে তো চলবে না। যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে জীবককে তিনি বললেন,—আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে তোমারও কিছু বলবার আছে। থাকলে বলো।

গুরুদেবকে না জানিয়ে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার জন্য জীবকের কুণ্ঠার অন্ত নেই। কিন্তু নিরপরাধ আচার্যের প্রতি সতীর্থ ছাত্রটির মিথ্যা অভিযোগ শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

তাই আচার্যের আদেশ কানে যেতেই সে উঠে দাঁড়াল উত্তেজিতভাবে, বললে,—সতীর্থ বন্ধুগণ, পিতৃপ্রতিম আচার্যের পুত্রস্থানীয় হয়ে আমাদের কেউ যে এমন ভাষায় এভাবে তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ আনার ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সতীর্থ ছাত্রটির সন্দেহ ও অভিযোগ যে কীরকম অন্যায় ও ভিত্তিহীন, এই নতুন ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার ঘটনাটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এজন্য আমিই পুরোপুরি দায়ী, সমস্ত দোষ আমার। গুরুদেব এর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। আমার এই গুরুতর অপরাধের জন্য গুরুদেবের কাছে আমি সর্বান্তকরণে মার্জনা ভিক্ষা করছি, আরও করব এবং যে শাস্তি প্রাপ্য হয়, অকুণ্ঠ চিত্তে মাথা পেতে নেব। কিন্তু সতীর্থ বন্ধুটির এ কী আচরণ!

তারপর সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে বললে,—সতীর্থ বন্ধুগণ, জীবের সেবা করার মহান আদর্শ বুকে নিয়ে সেই কৈশোরেই নিঃসঙ্গ আমি ঘর ছেড়েছিলাম। আর্তের সেবা করা এবং রোগ-ব্যাধি নিরাময় করে জীবকে শান্তি দেওয়াই চিকিৎসকের সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে আমি চিরকাল মনে করে এসেছি। তাই যখন দেখলাম, গুরুদেব হয়তো বার্ধক্য হেতু ভুল করে যে ব্যবস্থাপত্র দিলেন, তাতে রোগ আরও বৃদ্ধি পাবে, এমনকী রোগীর জীবনাশঙ্কাও অসম্ভব নয়, তখন আমি ধর্মচ্যুত হতে পারিনি। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যে অবহেলা করাকে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করেছিলাম। ছাত্র হিসাবে আচার্যের কাছে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন ব্যবস্থাপত্র না দিলে চিকিৎসক হিসাবে আমি যে অপরাধ করতাম, তা ক্ষমারও অযোগ্য বলে আমি মনে করি।

বলতে-বলতে সে আচার্যের পায়ের ওপর গড় হয়ে পড়ল।

বিস্ময়াহত ছাত্রদল স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। জীবকের মুখে ঘটনার বিচিত্র বিবরণ শুনতে-শুনতে তারা বোধহয় শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার কথাও ভুলে গেছে।

জীবক পায়ের ওপর গড় হয়ে পড়তেই আত্রেয় পরম স্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মস্তক চুম্বন করে বললেন,—বিচলিত হয়ো না পুত্র! তুমি যা করেছ, তার চেয়ে মহত্তর কাজ আর নেই। আমি ওটাই প্রত্যাশা করেছিলাম—বিশেষত তোমার কাছ থেকে। বাকিটুকু শুনলে সবই বুঝতে পারবে।

তারপর ছাত্রদের দিকে ফিরে তিনি বললেন,—এবার এই ঘটনার বাকিটুকু

তোমারা শোনো, যা কেউই জানে না। ছাত্রদের একাংশ, বিশেষত যারা পুরোনো, বারো-তেরো বছর এখানে অধ্যয়ন করছে, তারা যে জীবক সম্বন্ধে মনে-মনে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তা আমি জানতাম। কিন্তু যখন দেখলাম, অধ্যাপক হিসাব আমার সততা সম্পর্কেও তারা মিথ্যা অভিযোগ রটাতে শুরু করেছে এবং চতুষ্পাঠীর আবহাওয়া দিন-দিন বিষিয়ে তুলছে, তখন ঠিক করলাম, বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের এই দুষ্কর্মের প্রতিবিধান করব।

নিস্তব্ধ ছাত্রসভা। বৃদ্ধ আচার্য কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার শুরু করেন, —যে রোগের জন্য গতকালের প্রথম ব্যবস্থাপত্রখানা আমি দিয়েছিলাম, তা বিশেষ কঠিন কিছু নয়। তবু ইচ্ছে করেই গুরুতর ভুল ব্যবস্থাপত্র আমি দিয়েছিলাম। এবং আজ থেকে সেই অনুযায়ী তাদের চলতে বলে এসেছিলাম, যাতে রোগী ওই ওষুধ ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। পুরো একটা দিন সময় আমি সঙ্গের ছাত্রদের দিয়েছিলাম ওই ব্যবস্থাপত্র সংশোধন করবার। যদি কেউ সংশোধন না করত, তাহলে আজ প্রত্যুষে গিয়েই আমি সে কাজ করতাম। গিয়েছিলামও সেই জন্যে।

আচার্য চুপ করে কী যেন ভাবেন ক্ষণকাল। তারপর বিক্ষুব্ধ ছাত্রদলটির দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেন,—কিন্তু গিয়ে কী দেখলাম? দেখলাম, একমাত্র জীবক ছাড়া আর কেউ সে ভুল সংশোধন করতে এগিয়ে আসেনি। কী করেই বা আসবে? ব্যবস্থাপত্রের ভুল সম্বন্ধে কারও মনে কোনও সংশয়ই দেখা দেয়নি! সে ভুল ধরাব ক্ষমতা ওদের নেই। উপরন্তু জীবক যে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে এসেছিল, তা সে দিয়েছিল আমারই নামে। অপদার্থ পুরোনো ওই ছাত্র কয়টির সঙ্গে জীবকের চরিত্রের কী বিরাট পার্থক্য তোমরা লক্ষ করো। নতুন ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার সময় নিজের কৃতিত্ব জাহির করবার মানসে আচার্যের সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা জীবক করেনি। শুধু তাই নয়,—সে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, তা এমনই অপূর্ব ও অভিনব যে, আমার পক্ষেও তা দেওয়া বোধহয় সম্ভব হতো না।

আত্রেয় থামলেন। বিস্ময়ে আনন্দে জীবক অভিভূত। এ যে অভাবনীয়! অন্য সব ছাত্ররাও চমৎকৃত—অত্যন্ত খুশি। জীবকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সাময়িক যে কালিমা পড়েছিল, তা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তেমনি বিক্ষুব্ধ ছাত্র কয়টির প্রতি তাদের মনে জাগে অপরিসীম ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। ছাত্র কয়টির অবস্থাও তখন অত্যন্ত শোচনীয়—বিশেষ করে তাদের দলপতি লজ্জা ও অনুশোচনায় মাথা তুলতে পারছে না।

আবার জলদগম্ভীর কণ্ঠে আত্রেয় বললেন,—এই হলো জীবক। তার

তুলনায় ওদের চরিত্রে তোমরা কী দেখছ? ওরা হিংসুক মিথ্যাবাদী দুর্বিনীত। যে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, তাকে ওরা উচিত সম্মান দিতে জানে না, হিংসা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প দিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে চায়।

বলতে-বলতে তিনি তাকালেন বিক্ষুব্ধ ছাত্রনেতাটির দিকে, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—শোনো সঞ্জীব, তোমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তোমাকে শিক্ষাদান করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আগামীকালই তুমি চতুষ্পাঠী ত্যাগ করবে।

নত মস্তকে জীবক বসে আছে। আচার্যের কথায় ভয়ানক চমকে উঠল সে। কী সর্বনাশ! এত বড় শাস্তি! ছাত্রজীবনে এর চেয়ে বড় শাস্তি যে আর নেই!

বিমূঢ় জীবক গুরুদেবের দুই পা জড়িয়ে ধরলে,—গুরুদেব, ওদের ক্ষমা করুন! শুধু এইবারটির মতো ক্ষমা করুন!

বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরাও ছুটে এসে আচার্যের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। আচার্যের দুই চোখ জলে ভরে এসেছে। গভীর স্নেহে জীবককে আবার বুকে চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন,—আঃ কী শান্তি! প্রতিভাদীপ্ত মহাপ্রাণ শিষ্য পাওয়া যে কী শান্তি, তা কী করে বোঝাব! আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পুত্র, অদ্বিতীয় মহাপ্রাণ চিকিৎসক হিসাবে তোমার কীর্তি জগতে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে, যুগ-যুগান্ত ধরে পৃথিবীর মানুষ তোমায় স্মরণ করবে পরম শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়। বেশ, তাই হোক, তোমার অনুরোধে ওদের আমি এবারের মতো ক্ষমা করলাম।

॥ চার ॥

জীবকের চতুষ্পাঠী-জীবনের সপ্তম বর্ষ শেষ হওয়ার মুখে। তার শিক্ষাও সমাপ্তির দিকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কিছুই আর নেই, জীবকের যা শিখতে বাকি আছে—আত্রেয় এটা বুঝেছেন নিঃসংশয়ে। চোদ্দো বছরের শিক্ষা সাত বছরে শেষ! এটা অবিশ্বাস্য হলেও এর চেয়ে বড় সত্যি আর নেই। শুধু তাই নয়, চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয়েই প্রিয়তম ছাত্রটির জ্ঞান তাঁর চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক।

তবু শেষ আর একটা পরীক্ষা তিনি নিতে চান। এর ফলে তাঁর দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমত জীবকের শিক্ষা-সমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত কত নির্ভুল, তা সবাই বুঝবে, আর দ্বিতীয়ত চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবকের জ্ঞান কত গভীর, সেই বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহের লেশ থাকবে না।

সেদিন সবাইকে ডাকলেন তিনি। বললেন,—তোমাদের শিক্ষা কার কতদূর এগিয়েছে, আমি পরীক্ষা করতে চাই। তক্ষশিলার চারপাশে দুই ক্রোশের মধ্যে যত ডালপালা, লতাপাতা, উদ্ভিদ আছে, তোমরা প্রত্যেকে পৃথক-পৃথকভাবে গিয়ে তা থেকে এমন কিছু উদ্ভিদ আমায় এনে দাও, যার কোনও ভেষজ গুণ নেই, অর্থাৎ যা কোনও ওষুধে কাজে লাগে না। এজন্যে তোমাদের সাতদিন সময় দিচ্ছি।

সবাই বেরিয়ে পড়ল।

একে-একে ছয়দিন কেটে যায়। ইতিমধ্যে সব ছাত্রই ফিরে এসেছে—প্রত্যেকের হাতেই কম-বেশি কিছু-না-কিছু উদ্ভিদ। অনেকে গাছপালা, লতাপাতার বিরাট-বিরাট বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ফিরেছে। ফেরেনি শুধু জীবক।

সপ্তম দিনও শেষ হওয়ার মুখে। আত্রেয়ের মনে বিষম দুশ্চিন্তা,—কোথায় গেল ছেলেটি! উদ্বেগে ঘর-বার করছেন তিনি। সূর্য প্রায় ডোবে-ডোবে, এমনসময় জীবক ফিরল। শ্রান্ত ক্লান্ত শুকনো মুখ, ফিরল সে খালি হাতে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বললে,—গুরুদেব, আজ সাতদিন ধরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তন্নতন্ন করে সমস্ত অঞ্চল খুঁজলাম, কিন্তু এমন একটা উদ্ভিদ পেলাম না, যার কিছু-না-কিছু ভেষজ গুণ নেই।

আচার্যের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দেয়। শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন,—বাবা, তোমার দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। তোমার বক্তব্যই ঠিক। সত্যই, জগতে এমন একটা উদ্ভিদ পাবে না, যার কোনও ভেষজ গুণ নেই। বৎস, তোমার শিক্ষা শুধু সমাপ্তই নয়, এই শেষ পরীক্ষা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হল যে, পৃথিবীতে আজ এমন কেউ নেই, যিনি তোমাকে আর নতুন কিছু শেখাতে পারেন। চোদ্দো বছরের শিক্ষণীয় বিষয় তুমি সাত বছরে শেষ করলে, এ কৃতিত্বের তুলনা নেই। আশীর্বাদ করছি কর্মজীবনে তুমি সর্বোত্তম সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হাসিমুখে জীবক গুরুদেবকে প্রণাম করল।

॥ পাঁচ ॥

এবার জীবকের ফেরার পালা। তারই ব্যবস্থায় সে ব্যস্ত। এমনসময় সেদিন হঠাৎ গন্ধাররাজ পুষ্করসারীর কাছ থেকে তার কাছে এক দূত এসে উপস্থিত,—রাজা জীবককে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর ভগিনী পাণ্ডবা দীর্ঘকাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। জীবককে তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে।

জীবক যেন আকাশ থেকে পড়ে,—আমাকে কেন? গুরুদেব থাকতে আমাকে কেন এই আহ্বান? গুরুদেবই তো গন্ধারের রাজবৈদ্য!

গুরুদেবকে গিয়ে সে জানায় ঘটনাটা। বললে,—এ হয় কী করে? আপনি থাকতে, চিকিৎসক হিসাবে আমি যাব রাজবাড়িতে, এ অসম্ভব প্রস্তাবে আমি কখনই সম্মত হতে পারি না।

মৃদু হেসে আত্রেয় বললেন,—অত উতলা হয়ো না, পুত্র। আমারই পরামর্শে গন্ধাররাজ তোমায় আহ্বান করেছেন। তুমি বোধহয় জানো, তাঁর বোন পান্ডবা দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। দূর-দূরান্তের বহু দেশের বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক তার চিকিৎসা করেছেন। আমি তো করেইছি। কিন্তু কোনওই ফল হয়নি। তাই তুমি একবার যাও। দেখ, তাকে নিরাময় করতে পারো কিনা।

জীবক ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নত করে। আর্ত মানুষের সেবাই চিকিৎসকের মহত্তম কর্তব্য। সুতরাং—

আচার্যকে প্রণাম করে সে বলে,—তাই হোক, গুরুদেব। আপনার আদেশ শিরোধার্য।

দূতের সঙ্গে সে গেল রাজবাড়িতে। পুষ্করসারী তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে জানালেন পাণ্ডবার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা, তাকে অনুরোধ করলেন ভগিনীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে।

জীবক বললে,—মহারাজ, আপনার ভগিনীর চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে ঃ গুরুদেব আমার সঙ্গে থাকবেন।

এ প্রস্তাবে গন্ধাররাজের আপত্তি থাকার কথা নয়। সানন্দে রাজি হন তিনি।

নতুন করে এবার শুরু হয় পাণ্ডবার চিকিৎসা। জীবকের ব্যবস্থাপত্র দেখে আত্রেয় বারে-বারে চমকে যান। চমকের পর চমক। এমন অনেক ওষুধের ব্যবস্থা জীবক করছে, যার নামই তিনি শোনেননি। কী করেই বা শুনবেন? সবই যে জীবকের নিজের উদ্ভাবিত!

অভিভূত আচার্য মনে-মনে বলেন,—হ্যাঁ, আজ তুমি গুরু আমি শিষ্য। সার্থক আমার শিক্ষক-জীবন।

পাণ্ডবা সুস্থ হতে থাকে অতি দ্রুত! জীবকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তক্ষশিলা নগরে, সারা গন্ধাররাজ্যে।

শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাময় হল পাণ্ডবা।

পুষ্করসাবীর আনন্দের সীমা নেই। জীবকের প্রশংসায় সারা দেশ উচ্ছ্বসিত।

আদর আপ্যায়নে, খ্যাতি ও প্রশংসায় জীবক যেন হাঁপিয়ে ওঠে। উপরন্তু গন্ধাররাজ জীবককে যে পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তা এক বিরাট রাজসিক ব্যাপার।

কিন্তু এখানেই দেখা দিল বিপত্তি। জীবক ওসবের একটা কপর্দকও গ্রহণ করতে রাজি নয়। গ্রহণ করলও না। সবই সে নিবেদন করল গুরুদেবের চরণে।

সবাই চমকে যায়। চমকে যান গুরু-পত্নীও ঃ এ কী ব্যাপার!

আর চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের তো কথাই নেই। জীবকের উদারতা ও মহত্ত্ব দেখে তারা মুগ্ধ বিস্মিত। এ যে অভাবনীয় তাদের কাছে!

আর আত্রেয়! তিনি বিভ্রান্ত হতভম্ব বললেও কম বলা হয়। মহাজিজ্ঞাসা তাঁর মনে। জীবক নির্লোভ, জীবক উদার, জীবক মহৎ—তিনি জানেন। কিন্তু—কিন্তু—এ পারিশ্রমিক সব তো তারই প্রাপ্য, এর প্রতিটি কপর্দক! তবু সে তা গ্রহণ করছে না কেন? তিনি সঙ্গে ছিলেন, সেইজন্য? কিন্তু এ কথাটা জীবকই তো সবচেয়ে ভালো করে জানে যে, সমস্ত চিকিৎসা সে-ই করেছে, তিনি বড়জোর তার সহকারীর মর্যাদাটুকু পেতে পারেন।

আকাশপাতাল ভাবেন আত্রেয়। কিন্তু প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একসময় বিজলী-চমকের মতো তাঁর মনে পড়ে জীবকের সেদিনকার সেই প্রভাতকালের প্রতিজ্ঞা,—গুরুদেব, গন্ধারে কোনও রোগীর চিকিৎসা করতে বাধ্য হলে, তার সমস্ত পারিশ্রমিক আপনার চরণে নিবেদন করব গুরুদক্ষিণা হিসাবে।

এই কী তাহলে কারণ? জীবক তাহলে ফিরিয়ে নেয়নি তার প্রতিজ্ঞা? অপরিসীম লজ্জা, ক্ষোভ ও আত্মগ্লানি এসে ঘিরে ধরে আত্রেয়কে। নিজের কাছেই তিনি যেন মুখ দেখাতে পারেন না।

এবার গুরু-শিষ্যের মধ্যে শুরু হয় এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব, —শিষ্য দেবে গুরুকে, কিন্তু গুরু তা নেবেন না, ফিরিয়ে দেবেন শিষ্যকে। কিন্তু শিষ্যের এক কথা ঃ সে ওসবের এক কপর্দকও গ্রহণ করবে না।

গুরু শেষপর্যন্ত শিষ্যের শরণাপন্ন হলেন। সেদিনও ছিল প্রভাতবেলা, পূব দিগন্তে ঊষার রক্তিমাভা। জীবকের দুই হাত চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আত্রেয় বললেন,—বাবা, আমার সে অন্যায়ের কী ক্ষমা নেই? জীবনের বাকি কটা দিনও কী আমাকে গ্লানি, মনস্তাপ ও লাঞ্ছনার বোঝা বয়ে চলতে হবে? এই কী আমার বাকি জীবনের প্রাপ্য গুরুদক্ষিণা?

গুরুদেবের কথায় ও চোখের জলে জীবক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। কিছুই সে বুঝতে পারে না। তার সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে বেরিয়ে আসে

আর্ত জিজ্ঞাসা,—কী হয়েছে? কী হয়েছে, গুরুদেব? আমায় বলুন। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনার এই মনোকষ্ট দূর করব। আপনি কী শুধু আমার শিক্ষাদাতা গুরু, আপনি যে আমার পিতৃপ্রতিম!

বলতে-বলতে জীবক আচার্যের পদতলে বসে পড়ে। আত্রেয় তাকান প্রিয়তম ছাত্রের দিকে। তার চোখে-মুখে নিষ্পাপ শিশুর সারল্য। স্নেহে-আনন্দে আত্রেয়ের অন্তর ভরে ওঠে। সমস্ত কথাই তিনি খুলে বললেন জীবককে।

সমস্ত শুনে জীবক হতভম্ব। সে তো কোনও অন্যায় করেনি। নিজের প্রতিজ্ঞাই শুধু রক্ষা করতে চেয়েছে, গুরুদেবকে অপমান করার কথা তার স্বপ্নেরও অতীত।

যাই হোক, গুরু-শিষ্য আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, দীর্ঘ যাত্রার জন্য জীবক সঙ্গে নেবে দুজন রক্ষী, তিনটি ঘোড়া আর পাথেয় হিসাবে কিছু অর্থ। অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ, ধনরত্ন, মহার্ঘ পোশাক-পরিচ্ছদ, হস্তী, অশ্ব, রথ, দাসদাসী প্রভৃতি সবকিছু আত্রেয়ই গ্রহণ করবেন।

তারপর একদিন আসে সেই বিদায়ের লগ্ন। জীবক চিরতরে ছেড়ে যাবে চতুস্পাঠী!

আকাশ সেদিন মেঘাচ্ছন্ন। গুরু, গুরুপত্নী, বন্ধু-সতীর্থ, সকলের বুকে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা। বেদনা বুঝি প্রকৃতির বুকেও।

বিষাদম্লান পরিবেশে সর্বজনের উজাড়-করা আশীর্বাদ, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে জীবক পথে নামে একসময়।

আর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে সবাই। মানুষ কাঁদে, কাঁদে যেন ঘরের পশুপাখিরাও। প্রকৃতিও বুঝি চোখের জল ফেলে।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ এক ॥

গন্ধাররাজ্য পার হয়ে জীবক চলেছে পূব দিকে। গন্তব্যস্থলের স্থিরতা নেই। কোথায় গিয়ে যাত্রা শেষ হবে, তাও সে জানে না।

আত্মীয়-বিচ্ছেদ বেদনায় মন তার ভারাক্রান্ত। গুরুদেব ও গুরুপত্নীর কাছ থেকে সে পেয়েছিল বাবা-মায়ের অফুরন্ত স্নেহ ও আশীর্বাদ, সতীর্থ বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়েছিল বুকভরা অঢেল ভালোবাসা। শুধু কী তাঁরাই—সেখানকার প্রতিটি মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালা, সবাই যেন নিবিড় স্নেহে সহস্র বাহু মেলে তাকে আটকে রাখতে চেয়েছিল। সুদীর্ঘ সাত বছরের নিশ্চিন্ত স্নেহের ডোর ছিন্ন করে আসা যে কী কষ্টের, তা জীবকের চেয়ে কে বেশি বুঝবে! গুরুদেব, গুরুপত্নী ও অন্য সকলের আকুল মিনতি এখনও তার কানে বাজছে,—যেও না জীবক, তুমি যেও না, থেকে যাও আমাদের সঙ্গে। তক্ষশিলাতেই শুরু করো চিকিৎসা ও অধ্যাপনা।

কিন্তু তা হওয়ার নয়।

চতুষ্পাঠী-জীবনের কত ঘটনা, কত সুখস্মৃতি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। এখন সে কোথায় যাবে—কোথায়—কোথায়?

অবশ্য মানুষের সেবাকেই যখন সে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে, তখন আধিব্যাধিতে আর্ত মানুষ যেখানেই তাকে আহ্বান করবে, সে যাবে সেখানে। সেদিক থেকে দেখলে, সমগ্র বিশ্বই তার ঘর, সব মানুষই তার আপন।

বাল্য ও কৈশোরের মধুর স্মৃতিবিজড়িত রাজগৃহ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছাত্রজীবনে বারবার তার কল্পনায় ভেসে উঠেছে রাজগৃহের ছবি, বারবার স্বপ্ন দেখেছে পিতা অভয়কে। পালক-পিতা তিনি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর স্নেহের বুঝি শেষ নেই। পিতৃস্নেহের সে বাঁধভাঙা বন্যা মনকে সজল শ্যামল রেখেছে চিরদিন।

পরক্ষণে তার মনে জাগে নিজের অভিশপ্ত জীবনের মূল প্রশ্ন। জন্মপরিচয়হীন জীবন—বাবা-মার পরিচয় নেই। এই অপরিসীম লজ্জা ও কলঙ্কই তো তাকে ঘরছাড়া করেছে। যত দিন বাঁচবে, এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। পরিচিতজনের সংস্রব তাকে এড়িয়ে চলতে হবে।

পথ চলতে-চলতে জীবক ভাবে আর ভাবে! রাজগৃহের স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করে অন্তর থেকে। কিন্তু অত সহজে কী তা যাওয়ার!

মনে প্রশ্ন জাগে, জন্ম-পরিচয়ই কী মানুষের জীবনে সব? কর্ম পুরুষকার, এ সবের কী কোনওই মূল্যই নেই? মহাকালের বুকে কার আসন পাতা? কার জয়ডঙ্কা বাজে সেখানে? জন্মপরিচয়হীন কীর্তিমানের, না উচ্চবংশজাত কীর্তিহীনের? কোথায় পাবে সে এ মহাপ্রশ্নের উত্তর?

স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কাষ্ঠফলকের সেই লেখাটা। আজও সে ওটা পরম যত্নে রক্ষা করে চলেছে। ওটা যেন তার জীবনের ধ্রুবতারা। নৈরাশ্য ও অবসাদ মনের আকাশকে যখনি আচ্ছন্ন করতে চেয়েছে, সে সামনে ধরেছে লেখাটা, সঙ্গে-সঙ্গে মেঘ কেটে গেছে, আবার সে ফিরে পেয়েছে পথের নিশানা আর চলার শক্তি।

সত্যিই কী সে জন্মপরিচয়হীন? অজ্ঞাতকুলশীল? মনের গভীরে ডুব দেয় সে। কই, মন তো সায় দেয় না কথায়! অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন বারবার বলে,—না না, তা হতে পারে না। তাহলে কে লিখল ওটা? কেন লিখল?...আচ্ছা, কে তিনি? মা? হ্যাঁ, মা! মা-ই হবেন। জীবকের বুভুক্ষু মন হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ও ভালোবাসা দিয়ে কল্পনায় গড়তে চায় মায়ের এক অপূর্ব ধ্যানমূর্তি।

ধীরে-ধীরে তার অশান্ত মন কিছুকালের জন্য শান্ত হয় আবার। রাজগৃহের দুর্বার আকর্ষণ সে রোধ করতে পারে না। রাজগৃহকে সে ভালোবাসে, ভালোবাসে তার দেশবাসীকে—রাজগৃহ ও মগধের মানুষকে। দেশবাসীর সেবা করবে, এ বুঝি তার আবাল্যের স্বপ্ন। জীবক যেন নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে।

সে এগিয়ে চলে পূর্ব দিকে—মগধের পথে। কিন্তু আবার দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও সংশয়। মগধে যাওয়া কী ঠিক হবে? না, না—সেখানে আছে লজ্জা কলঙ্ক অপমান! আচ্ছা, অন্য রাজ্যের অন্য নগরে গিয়ে ঘর বাঁধলে কেমন হয়? কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী, সাকেত বা বারাণসী? বৎস রাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী? বৃজি-লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালী? বা অঙ্গরাজ্যের

রাজধানী চম্পা? কিংবা আরও দূরে দক্ষিণে অবন্তী রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী? সেখানে কেউ তার জন্ম-পরিচয় জানতে চাইবে না। মানুষের সেবাই যখন মূল প্রশ্ন, তখন রাজগৃহে কেন, যে কোনও স্থানে গিয়েও তো তা করা যায়!

জীবক মন স্থির করতে পারে না। অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। অন্তর্বেদনায় ছটফট করে সে। দেহের সবরকম ব্যাধির চিকিৎসা সে আয়ত্ত করেছে বটে, কিন্তু মনের এই ব্যাধির চিকিৎসা কোথায়? এ ব্যাধি তাকে সারা জীবন তিলে-তিলে দহন করবে, তাড়া করে ফিরবে শিকারি কুকুরের মতো।

গতি পূব দিকে হলেও জীবক সোজা পথ ধরে চলছে না। কোথায় যাবে স্থির নেই, তাই পথ তার আঁকাবাঁকা। এ জনপদ থেকে ও জনপদ, ও নগর থেকে সে নগর—এমনি করে এঁকেবেঁকে চলে তার পথ-পরিক্রমা।

কিন্তু যেখানেই সে যায়, রোগগ্রস্ত মানুষের সেবা করে প্রাণ দিয়ে। সেখানে ধনী-দরিদ্র্যের পার্থক্য নেই, অর্থের প্রত্যাশা নেই।

তার চিকিৎসায় নৈরাশ্যপীড়িত জীবনে ফোটে আশার আলো, নিরানন্দ জীবনে জাগে প্রাণের বন্যা। যে জীবন-দীপ নিবু-নিবু, দেশের বৈদ্যসমাজ যাকে জবাব দিয়ে গেছেন, তা আবার জ্বলে ওঠে নতুন তেজে।

জীবকের চিকিৎসা চলে সম্পূর্ণ নিজস্ব পন্থায়। নতুন-নতুন বিচিত্র ওষুধের উদ্ভাবনে কোনও ব্যাধিই দুরারোগ্য থাকে না তার কাছে। পক্ষাঘাত, আন্ত্রিক রোগ, শিরপীড়া, গুল্মরোগ, শোথ, কর্কটরোগ, চোখ-কান ও মুখের পীড়া, দুষ্ট ক্ষত ও ব্রণ—হেন রোগ নেই যা তার চিকিৎসার বাইরে।

যে পথ দিয়ে জীবক যায়, সেখানেই নবীন চিকিৎসকের অসামান্য ক্ষমতা ও সেবাব্রতী মনের পরিচয় পেয়ে নগর জনপদের অধিবাসীরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর মাথায় হাত দিয়ে বসেন স্থানীয় চিকিৎসক সমাজ। তাঁদের কাছে জীবক এক মহাবিস্ময়,—কোথা থেকে এল এই চিকিৎসক? কোনও ব্যাধিই তো এর কাছে দুরারোগ্য নয়! কে এই কন্দর্পকান্তি নবীন চিকিৎসক? কে? কে?

শেষ পর্যন্ত তাঁরা বাঁচার তাগিদে একত্র মিলিত হন এবং শলা-পরামর্শের পর বের করেন যে পথ, তা অবশ্য সম্মানজনক মোটেই নয়, কিন্তু আত্মরক্ষার পক্ষে বেশ কার্যকরী। তাঁরা মুখে-মুখে রটাতে থাকেন,—

নবীন চিকৎসক মানুষ নন, দেবতা। দেব-চিকিৎসক ধন্বন্তরি ইনি—মর্তে আবির্ভূত হয়েছেন স্বর্গরাজ্য থেকে।

জনরব যত ছড়াতে থাকে, মানুষের মধ্যে ততই শুরু হয় আলোড়ন। বিপুল জনতা কাতারে-কাতারে ভেঙে পড়ে দেবতার দর্শনলাভের জন্য।

জীবক বোঝে, তাকে দেশছাড়া করার জন্যই চিকিৎসকদের এই রটনা। নিজেদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নিরুপায় হয়ে তাঁরা অবলম্বন করেছেন এই পথ। তাকে দেবতার আসনে বসাতে পারলে নিজেদের অক্ষমতা মানুষের চোখে আর বড় হয়ে উঠবে না।

মানুষের এই ক্ষুদ্রতা আজ আর জীবককে তত বিচলিত করে না, বরং মনে জাগে করুণা, অক্ষম নিরুপায় মানুষের জন্য জাগে সহানুভূতি।

ধন্বন্তরি! কথাটা শুনে জীবক মনে-মনে হাসে। হ্যাঁ, স্বর্গের নয়, মর্তের ধন্বন্তরি হওয়াই তার জীবনের স্বপ্ন। সে দেখবে, এ স্বপ্ন সফল করা যায় কিনা।

তারপর একদিন সংগোপনে সে ত্যাগ করে সে অঞ্চল।

॥ দুই ॥

এমনি করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় জীবকের দিনে-দিনে বেড়ে চলে। আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলে তুমুল আলোড়ন তুলে, ঘুরতে-ঘুরতে শেষে একদিন সে এসে উপস্থিত হয় সাকেতে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ছয়টি শহরের অন্যতম সাকেত—ধনেজনে-উৎসবে-আনন্দে সদা-প্রাণোচ্ছল। ছবির মতো সে দাঁড়িয়ে আছে সরযূ নদীর তীরে। তার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির খ্যাতি ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত।

সেদিন সাকেতের এক পান্থশালায় জীবক বসে আছে, এমন সময় একটি ঘটনা কানে আসতেই সে সচকিত হয়ে উঠল। শুনলো—নগরের এক বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের কর্ত্রী, বয়স্কা মহিলা একজন, দীর্ঘকাল যাবৎ নিদারুণ শির পীড়ায় কষ্ট ভোগ করছেন। অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাই হেন বৈদ্য নেই, যাকে ডাকা হয়নি এবং হেন চিকিৎসা নেই, যা করা হয়নি। দেশ-দেশান্তর থেকে কত চিকিৎসক এসেছেন, অর্থও নিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। দিনে-দিনে রোগ আরও বেড়ে চলেছে। তাই রোগিনী, তাঁর স্বামী ও পরিবারের অন্য সবাই আজ হতাশ। তাঁরা ধরে নিয়েছেন—এ রোগ সারবার নয়, দুরারোগ্য, এই রোগেই মহিলাটির জীবনান্ত ঘটবে

এবং তার বোধহয় আর দেরিও নেই। সমস্ত পরিবারটি তাই শোকে-দুঃখে মুহ্যমান।

সাকেতে জীবক নবাগত। কোনও পরিচয়ই তার নেই। তাই লোক মারফৎ সে সংবাদ পাঠাল, রোগিনীকে সে একবার পরীক্ষা করতে চায়।

সঙ্গে-সঙ্গে আমন্ত্রণ এল পরদিন সকাল:বেলায়।

কিন্তু জীবককে দেখে পরিবারের সবাই শুধু অবাক নয়, হতাশ হয়—বিরক্তও হয়। সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হন বোধহয় রোগিনী নিজে। তাঁর চোখেমুখেও ফুটে ওঠে বিরক্তির ছাপ। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে গভীর বিরক্তির সঙ্গে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,—তুমি! তুমি কী করবে? নিতান্ত বালক তুমি! দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসকরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে তুমি করবে চিকিৎসা!

মৃদু হেসে ধীর সংযত কণ্ঠে জীবক বললে,—মা, আপনি শান্ত হোন। বয়স দিয়ে আপনি কী করবেন? জ্ঞানের ক্ষেত্রে বয়সের নবীনত্ব-প্রাচীনত্ব নেই। বয়স বেশি হলেই যে জ্ঞান বেশি হবে, এমন কী কারণ আছে? আপনার রোগ নিরাময় হওয়া নিয়ে কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ না করতে পারলে আমি এক কপদর্কও নেব না।

তারপর মহিলাটিকে সে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। জিজ্ঞাসাবাদও করল। রোগ অত্যন্ত কঠিন। তার আশঙ্কা হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো শল্য-চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হতে পারে, করোটি খুলতে হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক—তা পরের কথা।

তিন রকমের ওষুধ সে তৈরি করল। সম্পূর্ণ নতুন তিনটি ওষুধ। একটা সে দিল খাওয়ার জন্য, দ্বিতীয়টা দুই কানে ফোঁটা ফেলার জন্য আর বাকিটা একধরনের অতি মিহি গুঁড়ো—নস্যের মতো নাকে টানার জন্য। যাওয়ার সময় সে বলে গেল, তিনদিন পরে তাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

॥ তিন ॥

পরদিন বিকাল বেলা। জীবক পান্থশালায় বসে আছে, ভাবছে রোগিনীর কথা। এমনসময় রথ-অশ্বে সুসজ্জিত একটি দল এসে পান্থশালার দরজায় দাঁড়াল। দলে লোকজন অনেক। সবাই প্রায় সম্ভ্রান্তবংশীয়। সবার আগে একজন প্রবীণ নাগরিক। তাঁকে দেখে পান্থশালার পরিচালক থেকে পরিচারক সবাই শশব্যস্ত

হয়ে ওঠে,—কী ব্যাপার! সাকেতের বিনিশ্চয়ামাত্য বা প্রধান বিচারপতি মহামান্য সূর্যকুমার এখানে কেন?

সবাই ছুটে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানায়।

পরিচালকের কাছে সূর্যকুমার জানতে চান জীবকের সন্ধান, বলেন, —চিকিৎসক তিনি। সাকেতে নবাগত। নবীন যুবা, চেহারা কন্দর্পের মতো।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল জীবকের কাছে। দূর থেকে জীবক তাঁকে চিনতে পারে। মহিলাটির স্বামী তিনি।

জীবককে দেখেই বিনিশ্চয়ামাত্য ছুটে গিয়ে তার দুই হাত চেপে ধরলেন, সসম্ভ্রমে বললেন,—রথ এনেছি, আপনাকে আমাদের গৃহে যেতে হবে। এটা বিশেষ করে আমার স্ত্রীর অর্থাৎ আপনার রোগিনীর অনুরোধ।

বিস্ময়ে জীবক ক্ষণেক হতভম্ব, শেষে বিব্রত কণ্ঠে বলে,—কেন, কী হয়েছে? রোগিনী কেমন আছেন?

কেমন আছেন মানে!—আবেগকম্পিত কণ্ঠে বিনিশ্চায়ামাত্য বললেন, —সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি। নিদারুণ শিরপীড়ার যন্ত্রণায় এতদিন তিনি ছটফট করেছেন পাগলের মতো, মৃত্যু ছাড়া তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনও পথই খোলা ছিল না। আজ সে যন্ত্রণা তাঁর কাছে অতীতের বস্তু, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো। অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনা! দেশ-বিদেশের কত খ্যাতনামা চিকিৎসক, কত অর্থ ব্যয়, কত মনোকষ্ট-দুর্ভাবনা! আর একদিনের ওষুধ ব্যবহারেই কি না সবকিছুর অবসান! মর্তের ধন্বন্তরি আপনি! দয়া করে উঠুন। মর্তের ধন্বন্তরির স্থান সাকেতের নগণ্য এক পান্থশালায় নয়। এটা কিন্তু আমার কথা নয়—আপনার রোগিনীরই কথা।

হ্যাঁ, এবার আর দেবলোকের নয়, মর্তের ধন্বন্তরি হিসাবে জীবকের খ্যাতি নগর-জনপদ-দেশ-রাজ্যের সীমানা পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। সাকেত মহানগরী তাকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়। আরম্ভ হয় তার বিপুল খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থাগম।

তার আহ্বান আসে শ্রাবস্তী থেকে, বারাণসী থেকে, আসে চম্পা, বৈশালী ও কৌশাম্বী থেকে। ব্যাধিগ্রস্ত আর্ত মানুষ নবজীবনের আশায় কাতর আহ্বান জানায় মর্তের ধন্বন্তরিকে।

মহিলাটির স্বামীর কাছ থেকে জীবক পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক হিসাবে পায় অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ। এ ছাড়াও তার উপার্জন বিরাট।

সমস্ত অর্থ সে এক দিন দু-ভাগ করল। এক ভাগ পাঠিয়ে দিলে শ্রেষ্ঠী তিরীট-বৎসের কাছে। জানালো,—এটা আমার ঋণ পরিশোধ নয়, মহশ্রেষ্ঠী। আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। এটাকে গ্রহণ করবেন আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে।

দ্বিতীয় ভাগ সে পাঠাল রাজগৃহে—বাবা অভয়ের কাছে। লিখল—অসীম পিতৃস্নেহে আপনি আমায় প্রতিপালন করেছেন। সে ঋণ কখনই শোধ করার নয়। আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই সামান্য অর্ঘ্য আপনার চরণে নিবেদন করছি। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ এক ॥

রাজগৃহ। মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে।

শালবতীর কক্ষ। মুখোমুখি বসে আছেন দুজন মানুষ—অভয় ও শালবতী। কারও মুখে কথা নেই। বিষণ্ণ চিন্তাচ্ছন্ন দুজনেই।

শালবতীকে দেখে হঠাৎ চিনবার উপায় নেই। কী করুণ চেহারা হয়েছে তার! শীর্ণ কঙ্কালসার—অতীত তিলোত্তমার ছায়ামূর্তি যেন। দীর্ঘ সাত-সাড়ে সাত বছর আগে সেই যে অসুস্থ হয়েছিলেন শালবতী, তারপর আর সুস্থ হননি। স্বাস্থ্য দিন-দিন ক্ষয় হতে-হতে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চিকিৎসাও কম হয়নি। অভয়ের পীড়াপীড়িতে হেন চিকিৎসক নেই, যাকে ডাকা হয়নি। কিন্তু রোগ ধরতে পারেননি কেউ। বলে গেছেন, এটা এমনি এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার নিদান আজও অজ্ঞাত। আর তার ফলে বর্তমানে সমস্ত চিকিৎসাই বন্ধ করে দিয়েছেন শালবতী।

এ নিয়ে অভয় বা অন্য কেউ অনুযোগ করলে, ম্লান হেসে শালবতী বলেন,—আর কেন? এ রোগ সারার নয়। পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে তো!

অভয় ও শালবতী বসে আছেন। ঘরে বিষাদ ও দুশ্চিন্তার ছায়া। জীবকের বিপুল যশ ও খ্যাতির তরঙ্গ রাজগৃহেও এসে আঘাত করেছে। কত আশা ও আনন্দ নিয়েই না অভয় তার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে বসে ছিলেন? মনে-মনে দিন গুনেছেন, সাকেতে যখন সে এসে গেছে তখন রাজগৃহে ফিরতে আর বিলম্ব করবে না।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃতী সন্তানকে বুকে তুলে নেবেন—এ যে কত বড় কামনা, তা অভয় ছাড়া আর কে বুঝবেন? শুধুই কী তাই? আরও একটা গোপন বাসনা ছিল অভয়ের। জীবককে দিয়ে তিনি শালবতীর

পালিত পুত্র? সে তো বহুকাল আগে রাজগৃহ থেকে অদৃশ্য হয়েছিল! এতদিন কোথায় ছিল?

অভয় ধীরে-ধীরে সমস্ত ঘটনা খুলে ধরলেন বিম্বিসারের কাছে। শেষে বললেন,—চিকিৎসক হিসাবে তার কৃতিত্বের যেসব ঘটনা আমি শুনেছি, তাতে যিনি যাই বলুন, এসব কিছুকে মিথ্যা রটনা বলে আমি উড়িয়ে দিতে পারিনে।

বিম্বিসার বললেন,—সে যাই হোক, জীবককে অবিলম্বে এখানে ডেকে পাঠানো প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নেই। কালই আমি পত্র দিয়ে উপযুক্ত লোক ও যানবাহন পাঠাতে চাই। তাদের পাঠানোর ভার তুমিই নাও, অভয়। তাদের প্রথম যেতে হবে কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তী। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আমার শ্যালক হলেও তাঁর অনুমতি নিতে হবে। কারণ জন্মস্থান রাজগৃহ হলেও জীবক বর্তমানে কোশলরাজ্যে বাস করছে।

॥ দুই ॥

জীবক যাত্রা করেছে শ্রাবস্তীর পথে। সাকেতের নাগরিকরা, বিশেষত সেই ভদ্রমহিলা, তাঁর স্বামী ও পরিবারের অন্য সবাই তাকে কিছুতেই ছাড়তে রাজি ছিলেন না। সাকেতের মানুষের কাছ থেকে সে পেয়েছে অঢেল স্নেহ ও ভালোবাসা। তবু বর্তমান মানসিক অস্থিরতা নিয়ে তার পক্ষে কোথাও বেশিদিন বাস করা সম্ভব নয়।

তীরবেগে রথ ছুটে চলেছে। সঙ্গে তার চারজন অশ্বারোহী সশস্ত্র রক্ষী, আর দুজন ভৃত্য। শ্রাবস্তীতে কিছুদিন কাটিয়ে সে যাবে বারাণসী, সেখান থেকে বৈশালী। তারপর? তারপর সে জানে না। অসুস্থ আর্তের আহ্বান আসবে যেখান থেকে, যাবে সেখানেই। ভবিষ্যৎ বড় অস্পষ্ট। কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জীবক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়ল। দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাদের পথ রোধ করেছে। তাদের সাজপোশাক অস্ত্রশস্ত্র দেখে জীবকের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাদের নজন সৈনিক—সামরিক বিভাগের লোক, আর দলের যিনি অধিনায়ক, তিনি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ।

রাজপুরুষটি এগিয়ে এসে জীবককে অভিবাদন করে বিনীত কণ্ঠে বললেন,—কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি সাকেত থেকে আসছেন? একান্ত প্রয়োজনেই এভাবে পথ রোধ করে আপনাদের বিরক্ত করছি। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

হ্যাঁ, সাকেত থেকে।—জীবক বললে, কিন্তু কেন বলুন তো?

রাজপুরুষটি বললেন,—বৈদ্যরাজ জীবকের দর্শনলাভের আশায় দূর রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী হয়ে আমরা আসছি। মহারাজ বিম্বিসার অসুস্থ। নিজের চিকিৎসার জন্য তাই তিনি বৈদ্যরাজকে রাজগৃহে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রাবস্তী থেকে রওনা হয়ে পথে এক বণিকদলের কাছে শুনলাম, বৈদ্যরাজ নাকি শ্রাবস্তীর পথে সাকেত ত্যাগ করেছেন, অথবা করার মুখে। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কী?

জীবকের মুখে কথা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় সে এমনি হতভম্ব যে, বাকরোধ হওয়ার মতো অবস্থা। বিস্ময়ে, আনন্দে বুক তার তোলপাড়। কানে বাজছে শুধু কয়েকটি কথা,—মহারাজ বিম্বিসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন! মহারাজ অসুস্থ!

আঃ, তার স্বপ্নের রাজগৃহ!

এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তা বুঝি তার স্বপ্নেরও অগোচর।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে সে বললে,—আমিই জীবক। দেখি মহারাজের বার্তা।

আপনিই বৈদ্যরাজ!—বলতে-বলতে রাজপুরুষটি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। বিস্ময়ে তিনিও হতবাক। বিহ্বল চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকেন জীবকের দিকে। তারপর সসম্ভ্রমে আবার অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে দেন মহারাজের পত্রখানা।

পত্র পড়ে জীবক চমকে যায়। বুক উদ্বেল হয়ে ওঠে। মহারাজ তাকে নাম ধরে লিখেছেন, সম্বোধন করেছেন 'তুমি' বলে। পিতা অভয়ের কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই জেনেছেন তার পরিচয়। লিখেছেন, দুষ্ট ক্ষতরোগে তিনি দীর্ঘ দিন অসুস্থ। সে যেন পত্র পাওয়া মাত্র রাজগৃহে রওনা হয়।

মুহূর্তে জীবক মন স্থির করে ফেলে। বললে,—বেশ চলুন, এখুনি রওনা হওয়া যাক।

বিনীত কণ্ঠে রাজপুরুষটি বললেন,—মহারাজ আপনার জন্য রথ পাঠিয়েছেন। দয়া করে ওই রথে আরোহন করুন।

জীবক এতক্ষণ লক্ষ করেনি ঃ অদূরে দাঁড়িয়ে আছে চারঘোড়ায়টানা প্রকাণ্ড রাজকীয় রথ।

॥ তিন ॥

জীবককে নিয়ে রাজকীয় রথ ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে রাজগৃহের দিকে। আর ভৃত্যদের নিয়ে পেছনে আসছে অশ্বারোহী দল।

জীবকের বুক অশান্ত। মনে খণ্ডছিন্ন অসংখ্য চিন্তাব আনাগোনা। দীর্ঘ আট বছর আগে—হ্যাঁ আট বছর তো হবেই—সে রাজগৃহ ত্যাগ করেছিল। আজ আবার ফিরছে। রাজগৃহ তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে? তার জন্ম-পরিচয়ই কী সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে? তাহলে কী হবে?

রাজগৃহ যত নিকটবর্তী হয়, ততই বাড়তে থাকে জীবকের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এইভাবে হঠাৎ যাত্রা করা কী সঙ্গত হয়েছে? তার সম্বন্ধে রাজগৃহের নাগরিকদের কী মনোভাব, সে সম্বন্ধে আগে খোঁজখবর নেওয়া কী উচিত ছিল না? এমনি সব চিন্তায় বিক্ষিপ্ত জীবকের মন।

নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে...

ধীরে-ধীরে একসময় দূরে—বহু দূরে জেগে ওঠে রাজগৃহের পঞ্চগিরি শীর্ষ।

রথ ছুটে চলে...

ধীরে-ধীরে জীবকের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে তার স্বপ্নের, বড় সাধের রাজগৃহ।

উত্তেজনায় সে বুঝি স্থির থাকতে পারে না। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

হঠাৎ সে এক সময় চমকে ওঠে,—ও কী! নগর-প্রকারের বাইরে অত লোক কেন? কাতারে-কাতারে মানুষ!...

তারপর একসময় রাজগৃহে পৌঁছয় জীবক। স্তম্ভিত সে।

হাজার-হাজার নাগরিক পথে নেমে এসেছে। অট্টালিকার অলিন্দে-অলিন্দে নরনারীর ভিড়। আর পথে-পথে নানা বর্ণের সুদৃশ্য তোরণ।

আনন্দে, উৎসবে উচ্ছ্বসিত আজ রাজগৃহের নাগরিকরা। পৃথিবীর বিস্ময় যে দেবকান্তি তরুণ বৈদ্যশ্রেষ্ঠ, সেই মর্তের ধন্বন্তরি জীবক তাদেরই সন্তান, রাজগৃহের নাগরিক! সেই সন্তান আজ ঘরে ফিরছে। তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তাই রাজকীয় উৎসবের সাজ পরেছে রাজগৃহ। তাকে দেখার জন্য তাই মানুষের এত ভিড় ও ব্যগ্রতা।

লাজ ও পুষ্প বৃষ্টি আর জয়ধ্বনির মধ্যে অভিভূত জীবক রথে বসে নিশ্চল কাঠের পুতুলেব মতো—স্বপ্নাবিষ্ট সম্মোহিত যেন।

তার ঘোর কাটল, যখন রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে অভয় তাকে বুকে

জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখে জল। জীবক তাঁকে প্রণাম করল। তারও চোখ অশ্রুসিক্ত।

মহারাজ বিম্বিসারের কাছ থেকেও সে পায় স্নেহের অভ্যর্থনা। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিলেন।

কুশলপ্রশ্নাদির পর জীবক বিম্বিসারের ক্ষত পরীক্ষা করল। বহুক্ষণ ধরে নানাভাবে পরীক্ষার পর গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে,—মহারাজ, বিষাক্ত এই দুষ্ট ক্ষত সাধারণ ওষুধে নিরাময় হওয়ার নয়। এর ঝোঁক কর্কট রোগের দিকে, তার লক্ষণ স্পষ্ট।

কর্কট রোগ! দুরারোগ্য কর্কট রোগ!—বিচলিত হতাশ কণ্ঠ বিম্বিসারের। অন্যদিকে চোখে-মুখে ফুটে ওঠে নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও বিষাদ।

বিচলিত হবেন না, মহারাজ!—দৃঢ় কণ্ঠে জীবক বলে, আশ্বস্ত হোন। এ ক্ষত অবশ্যই নিরাময় হবে। তবে কত দিনে, তা এখনই বলতে পারছিনে। দু-এক দিন সময় লাগবে বলতে।

তারপর জীবক আত্মনিয়োগ করে নতুন এক ধরনের ওষুধ তৈরির কাজে। অভিনব তার প্রস্তুত প্রণালী। দিন-রাত সে ডুবে থাকে কাজের মধ্যে।

তৃতীয় দিন ভোরবেলায় নিজের তৈরি জলীয় এক পদার্থ দিয়ে ক্ষতটি পরিষ্কার করে জীবক, তাতে লাগিয়ে দেয় নতুন এক ধরনের প্রলেপ। বিচিত্র মিষ্টি তার গন্ধ। ওষুধ লাগানো শেষ করে সে বললে,—এমনিভাবে নিত্য প্রভাতে এই ওষুধ লাগাতে হবে। আমিই লাগাব। সাত দিনের মধ্যে এ ক্ষত আরোগ্য হবে।

সাতদিন! মাত্র সাতদিন?—বিম্বিসারের কণ্ঠে জাগে শুধু বিস্ময় আনন্দই নয়, অবিশ্বাসেরও আভাস যেন।

কিন্তু তা-ই হল। দ্বিতীয় দিন থেকে ক্ষত শুকোতে আরম্ভ করে। কমতে থাকে যন্ত্রণাও। তারপর সাত দিনের দিন ক্ষত শুধু আরোগ্যই হল না, সবিস্ময়ে সবাই দেখল, সেখানে যে এককালে কোনও ক্ষত ছিল, তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, এমনিভাবে তা মিলিয়ে গেছে।

এই অবিশ্বাস্য অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে দেশ-বিদেশের চিকিৎসক সমাজ যেমন স্তম্ভিত, তেমনি জীবকের প্রশংসায় উদ্বেল উচ্ছ্বসিত শুধু রাজগৃহই নয়, গোটা মগধরাজ্য।

আরোগ্য লাভের পর অল্প দিনেই মহারাজ বিম্বিসারের পূর্বেকার স্বাস্থ্য ফিরে এল, ফিরে এল সেই শক্তি ও অনিন্দ্যসুন্দর উজ্জ্বল রূপ।

কিন্তু মনে তাঁর স্বস্তি নেই।

দুর্ভাগ্য বুঝি জীবকেরও সঙ্গের সাথী। তার সম্পর্কেই বিম্বিসারের মনে জেগেছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। জীবকের অসাধারণ জনপ্রিয়তায় তিনি বিশেষভাবে বিচলিত। চরদের কাছ থেকে দিনের পর দিন যতই তিনি শুনছেন জীবকের এই জনপ্রিয়তার নানা গোপন সংবাদ, ততই বাড়ছে তাঁর সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করেন,—যতই হোক জীবক অজ্ঞাতকুলশীল, অভয়ের পালিত পুত্র মাত্র; ও যেরকম বুদ্ধিমান ও অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে যেরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাতে ওকে পরীক্ষা না করে রাজধানীতে রাখা কখনই নিরাপদ হবে না। মনের কোথাও যদি কোনও খারাপ অভিসন্ধি বা ক্ষমতালিপ্সা থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে ওর কাছ থেকে গুরুতর বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু কী ধরনের পরীক্ষা হবে?

অনেক ভেবে জীবককে তিনি প্রকাশ্য রাজসভায় সর্বসমক্ষে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করলেন। তার সামনে এদিন যেসব পারিতোষিক রাখা হল, তার মধ্যে আছে মহামূল্য নানা রাজপোশাক ও অলঙ্কার-আভরণ আর আছে একখানা তরবারি ও কিছু পুষ্পস্তবক।

জীবক কিন্তু ও সবের কিছুই গ্রহণ করল না। শুধু শুভ্র সুগন্ধি একটা ফুল তুলে নিয়ে বলল,—মহারাজ, ক্ষমা করবেন. আমার মতো সামান্য লোকের পক্ষে রাজপরিচ্ছদ ব্যবহার করা ধৃষ্টতামাত্র। আর তরবারি দিয়েই বা আমি কী করব? চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের সেবা করাকেই আমি জীবনের ধর্ম ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছি। এ কাজে আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব—সে-ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর কোনও পুবস্কার চাই না।

জীবকের কথায় রাজসভায় যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তার নামে জয়ধ্বনি ওঠে সর্বত্র। আর বিম্বিসার? জীবকের নির্লোভ মহৎ হৃদয়ের প্রমাণ পেয়ে চমৎকৃত তিনি। সিংহাসন থেকে উঠে গিয়ে জীবককে তিনি গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন, তার মস্তক চুম্বন করে তখনই আদেশ দিলেন, মগধের রাজবৈদ্য-পদে জীবককে অভিষিক্ত করা হোক!

জীবকের অভিষেক! বিরাট সে রাজকীয় আয়োজন। রাজধানীর পথে-পথে বিচিত্রসুন্দর সব তোরণ তৈরি হয়। উৎসবে মেতে ওঠে নাগরিকরা।

রাজগৃহের সন্তান রাজবৈদ্য জীবককে নিয়ে তাদের গর্ব ও গৌরবের বুঝি অন্ত নেই।

মগধের রাজবৈদ্যের বসবাসের জন্য মহারাজ বিম্বিসার দান করলেন সুরম্য প্রাসাদ, বহু উদ্যান ও গ্রাম। রাজানুজ্ঞায় জীবকের উপাধি হল 'মগধরাজবৈদ্য ভিষগাচার্য জীবক কৌমারভৃত্য'। রাজবৈদ্যের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি।

॥ চার ॥

দিন যায়।

মহারাজ বিম্বিসারের অফুরন্ত স্নেহ লাভ করেছে জীবক। বিভিন্ন ঘটনায় জীবকের অত্যাশ্চর্য বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পেয়ে মহারাজের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি নেই। যেমন চিকিৎসাবিদ্যায়, তেমনি রাজকার্যে ও বিভিন্ন শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখে তিনি বিমোহিত। জীবক আজ তাই শুধু তাঁর চিকিৎসকই নয়, তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা—একান্ত সচিব।

রাজগৃহ সমেত সমগ্র মগধরাজ্য জীবকের প্রশংসায় মুখর। সবারই মুখে এক কথা—রাজবৈদ্য শুধু মর্তের ধন্বন্তরিই নন, অপূর্ব উদারচরিত্রের মানুষ তিনি। চিকিৎসার প্রশ্নে তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ নেই—সবারই অবারিত দ্বার। তাঁর চিকিৎসার গুণে আজ রোগে মৃত্যু নেই বললেই হয়।

এমনিভাবে দিন যায়। এমন সময় ঘটল একটি ঘটনা।

মানুষ এতদিন জীবকের ভেষজ-চিকিৎসাই শুধু দেখেছে, এবার রাজ-অমাত্য অশ্বকের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তারা সবিস্ময়ে দেখল তার শল্য-চিকিৎসার অপূর্ব ক্ষমতা।

মগধ রাজসভার অন্যতম প্রভাবশালী অমাত্য অশ্বক—কিছুদিন থেকে নিদারুণ শিরঃপীড়ায় ভুগছেন। নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের কোনও উপশম হয়নি। শেষ পর্যন্ত তা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল যে, দুঃসহ যন্ত্রণায় অশ্বকের অবস্থা পাগলের মতো। তাঁর মনে হয়, তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে তাঁর মাথার ভেতরটা কে যেন টুকরো-টুকরো করে কাটছে।

খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসকরা শেষপর্যন্ত জবাব দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন,—দুবারোগ্য এ ব্যাধি চিকিৎসার বাইরে। কিছু দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু অবধারিত।

সংবাদটা শেষপর্যন্ত বিম্বিসারের কানে গেল, নিয়ে এল অশ্বকের পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজনেরা। বিম্বিসার অত্যন্ত অবাক হলেন। অশ্বকের শিরঃপীড়ার কথা তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু তা যে এত গুরুতর দাঁড়িয়েছে, সে কথা তো কেউ তাঁকে বলেনি।

তা ছাড়া,—তিনি জিগ্যেস করলেন,—জীবককে ডাকা হয়নি কেন?

অশ্বকের পুত্র-ভ্রাতা সবাই আমতা-আমতা করতে থাকে। কোনও সদুত্তর নেই। শুধু বোঝা গেল, প্রবীণ চিকিৎসকের প্ররচণায় অজ্ঞাত-কুলশীল জীবকের ওপর তাদের বিশেষ আস্থা ছিল না।

যাই হোক, বিম্বিসার তখনি জীবককে ডেকে পাঠালেন। বললেন,—অশ্বকের চিকিৎসার দায়িত্ব নাও তুমি। দেখ, কিছু করতে পারো কিনা।

রোগ পরীক্ষা করে ও লক্ষণাদি দেখে জীবক বুঝল, রোগ বর্তমানে এত গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ভেষজ-চিকিৎসায় আর তা নিরাময় হওয়ার নয়। রোগীর নিকটতম পরিজনদের একান্তে ডেকে নিয়ে রোগের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে সে বললে,—শল্য-চিকিৎসার দ্বারা রোগীর করোটি উন্মুক্ত করতে হবে। তা ছাড়া পথ নেই।

সবাই শিউরে উঠল। তাদের আকুল প্রশ্ন —এ ছাড়া কি আর কোনও পথ নেই?

—না।

শিউরে উঠলেন মহারাজ বিম্বিসারও। কিন্তু করারই বা কী আছে! শেষ সময়ে জীবকের ডাক পড়েছে। মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন শেষ চেষ্টা করা ছাড়া উপায়ই বা কী আছে?

সুতরাং জীবকের অস্ত্রোপচার শুরু হয়।

দুজন সহকারী নিয়ে নিজের উদ্ভাবিত শস্ত্রের সাহায্যে সে ক্ষিপ্রহাতে রোগীর করোটি খুলে ফেললে। দেখে, মস্তিষ্কের এক স্থানে বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, অল্প-অল্প রক্ত ঝরছে সেখান থেকে।

ক্ষতস্থানে ভালো কারে এক প্রকার মলম লাগিয়ে আবার সে করোটি সেলাই করে ফেললে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে। বললে, আর ভয় নেই।

তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়।

এবার অসাধারণ শল্য-চিকিৎসক হিসাবে জীবকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তার খ্যাতির জয়ডঙ্কা বাজে ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তে—বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানা ও ব্যবধানে তা বাধা মানে না।

এমন সময় একদিন মগধের রাজসভায় গুরুতর বার্তা নিয়ে এলো কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিশেষ দূত। মহারাজ প্রসেনজিৎ গুরুতর অসুস্থ। সর্বপ্রকার চিকিৎসাই নিষ্ফল হয়েছে। তাই তিনি আজ মগধরাজের শরণাপন্ন। মগধরাজবৈদ্য ভিষগাচার্য জীবক কৌমারভৃত্যকে দিয়ে তিনি একবার শেষ চিকিৎসা করাতে চান। তাই তাকে অবিলম্বে শ্রাবস্তীতে পাঠানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মহারাজ বিম্বিসার, ব্যস্ত হলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী মগধের রাজমহিষীও।

বিম্বিসারের নির্দেশে জীবক রাজবৈদ্যের উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে অবিলম্বে যাত্রা করল শ্রাবস্তীর উদ্দেশে।

মগধের রাজবৈদ্য মর্তের ধন্বন্তরি জীবক আসছেন!—এ বার্তা ছড়িয়ে পড়ে শ্রাবস্তীতে, ছড়িয়ে পড়ে কোশলরাজ্যের দিকে-দিকে! তার যাত্রাপথে জনপদে-জনপদে জনতার সে কী ভিড়! তার দর্শনলাভের জন্য উন্মুখ জনতার সে কী আকুলতা!

তুমুল রাজকীয় অভ্যর্থনার মধ্যে জীবক এক সময় গিয়ে উপস্থিত হল প্রসেনজিতের কাছে। কোশলরাজকে পরীক্ষা করে সে বুঝল—এতদিন ভুল চিকিৎসা হয়েছে, তিনি শোথ রোগে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসা শুরু হল। মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হলেন মহারাজ প্রসেনজিৎ।

জীবকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও মানবিক চরিত্রগুণে মুগ্ধ বিস্মিত প্রসেনজিৎ, মুগ্ধ বিস্মিত রাজপরিবার এবং শ্রাবস্তী ও কোশলরাজ্যের আবালবৃদ্ধবণিতা।

তারপর সর্বজনের অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মাথায় নিয়ে জীবক যেদিন আবার রাজগৃহে যাত্রা করল, সেদিন তাকে বিপুল ধনৈশ্বর্য ও মহামূল্যবান রাজপোশাকাদি উপঢৌকন দিয়েও যেন আশ মেটে না প্রসেনজিতের।

॥ পাঁচ ॥

জীবকের জন্য অভয়ের গর্ব ও আনন্দের সীমা নেই। সুখী শালবতীও।

কিন্তু যাকে নিয়ে এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, তার মনে শান্তি নেই। বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ সে। দুর্নিবার এক অভাববোধ তাকে দহন করে দিনরাত। মাথার মধ্যে অবিরত ঘোরে একমাত্র চিন্তা!—জগতে সম্পূর্ণ একলা সে। সবারই

মা-বাবার পরিচয় আছে, নেই শুধু তার। রাজগৃহের সবাই তো জানে এ কথা, তাই এ নাগরিক সমাজে কোথায় তার স্থান? একলা সে—একেবারেই নিঃসঙ্গ একলা!

ভয়ঙ্কর এ চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে ছটফট করে, ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

দিনরাত সে ডুবে থাকে কাজের মধ্যে। সূর্যোদয়ের আগেই পিতা অভয়কে প্রণাম করে এসে কাজ শুরু করে। নতুন-নতুন ভেষজ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য চলে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর আরম্ভ হয় মানুষের পরিচর্যা—রোগীর চিকিৎসা।

এই সময় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে আর্যাবর্তে জেগেছে বিপুল উল্লাস, নতুন চেতনা ও আদর্শের প্রাণবন্যায় জনজীবন আলোড়িত।

ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে নানা মত ও পথের সংঘাত তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ভারতবর্ষের দিকে-দিকে নিজ-নিজ তত্ত্ব প্রচারে রত আছেন ছোট-বড় অনেক ধর্মাচার্য ও শিক্ষক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব একেবারেই অনন্য। অন্যদের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা এবং বৈদিক ধর্মে যে জটিলতা ও অবনতি দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় বুদ্ধের শিক্ষা আশ্চর্য সহজ, সরল, বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী।

সমাজে জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধ মানেন না, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ নেই তাঁর কাছে। সবাইকে ডাক দিয়ে বলছেন বুদ্ধ তথাগত,—জীবনে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি যদি পেতে চাও, তাহলে যাগযজ্ঞ, পশুবলি, মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের নিষ্ফল আড়ম্বর ত্যাগ করো। শরীরকে কষ্ট দিয়ে যে তপশ্চর্যা, ত্যাগ করো সে পথ। ত্যাগ করো বিলাসব্যসন। অবলম্বন করো মধ্য পন্থা—সেখানে আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনের যেমন আতিশয্য থাকবে না, তেমনি থাকবে না দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে পুণ্য লাভের চেষ্টা অর্থাৎ তপশ্চর্যাদির দ্বারা শরীরকে কষ্ট দিয়ে মুক্তি দিয়ে লাভের প্রয়াস। সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন করতে হবে, সৎপথে বিচরণ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ, চৌর্য ও জীব-হিংসা। তবেই মিলবে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তিপথের সন্ধান।

শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে বুদ্ধদেব এ সময় রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করছেন। মহারাজ বিম্বিসার বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করেছেন এই বেণুবন।

মানুষ সেখানে যাচ্ছে দলে-দলে। যাচ্ছে রাজা ও বণিক, যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটে যায় সবাই, শোনে বুদ্ধের বাণী এবং তাঁর সহজ সুন্দর ব্যাখ্যার মধ্যে যেন খুঁজে পায় জীবনের রহস্য।

তাদেরই কথ্য ভাষায় তাদের মতো করে বুদ্ধদেব বুঝিয়ে বলেন নিজের শিক্ষা। অপূর্ব মনীষা ও মানবপ্রেমে দীপ্ত সে মহান প্রতিভার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে-পুলকে রোমাঞ্চিত মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শোনে সেই বাণী।

সামাজিক নির্যাতন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা ও নিপীড়ন থেকে তারা বুঝি মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ধর্ম ও জীবনের এক নতুন দ্বার যেন খুলে যায় তাদের চোখের সামনে, তার দীপ্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাদের মনোজগৎ। সেখানে মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ ও অলৌকিকত্বের বাহুল্য নেই, নেই উপনিষদের দুরূহ তত্ত্বের জটিলতা। জাতি ও বর্ণের বাধাও নেই সেখানে। সমাজে যে ঘৃণিত বা অপাংক্তেয়, সে-ও বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে মধ্যপথ অনুসরণ করে নির্বাণ বা পূর্ণ মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে পারে।

কিন্তু এসব ব্যাপারে জীবকের বিশেষ আগ্রহ নেই। বুদ্ধদেব বর্তমানে বেণুবনে বাস করছেন, সে জানে। মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট, তাও তার অজানা নয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বুদ্ধকে দর্শন করার বা তাঁর বাণী শোনার কোনও আগ্রহ বা সাড়া সে বোধ করে না অন্তর থেকে।

এমন সময় বিম্বিসার তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন, বললেন,—জীবক, গুরুতর কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে শাস্তা তথাগত কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নাও।

রাজাদেশ শিরোধার্য করে জীবক সেদিনই চলল বেণুবন বিহারে।

বিহারে ঢুকে সে আশ্চর্য হয়,—বিহার নিস্তব্ধ কেন?

ভিক্ষুদের কুটিরে বা পথে কারও দর্শন মেলে না। অথচ বিহারে বহু ভিক্ষু বাস করেন, সে শুনেছে। তাঁরা সব গেলেন কোথায়?

সঙ্গের পথ-প্রদর্শকটি বললে,—তথাগতের উপদেশ শোনার জন্য সবাই এখন ধর্মসভায় সমবেত হয়েছেন।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর জীবকের কানে আসে এক সুললিত কম্বুকণ্ঠ। শ্রদ্ধাপ্লুত গলায় পথপ্রদর্শক বলে,—ওই শোনা যায় তথাগতের কণ্ঠস্বর।

ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে জীবকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বিশাল

জনমণ্ডলী, কিন্তু গভীর নিস্তব্ধতা সেখানে। শুধু ভিক্ষু নন, বহু সাধারণ মানুষও সমবেত হয়েছেন। উঁচু এক বেদিকার আসনে বুদ্ধ সমাসীন—উপদেশ দিচ্ছেন।

ধীর পায়ে জীবক এগিয়ে যায়। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই বুদ্ধের মুখে যেন মৃদু এক হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে গেল। ক্ষণিকের হাসি, ক্ষণিকের দৃষ্টিপাত—কিন্তু জীবকের মনে হয় যেন কত আপন, কত কালের পরিচিত। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে সেখানেই বসে পড়ে।

বুদ্ধ তথাগত তখন বলছেন, যেন জীবককে উদ্দেশ্য করেই,—মানব-জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল সে মানুষ। সর্বোত্তম মনুষ্যত্ব অর্জন করাই তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ হওয়া উচিত। এখানে জাতি, বর্ণ ও জন্মের ভেদাভেদ নেই। ওসব মিথ্যা, অলীক। সমাজে এ মিথ্যার প্রাচীর মানুষই সৃষ্টি করেছে নিজের স্বার্থে। যে মানুষ ওসব নিয়ে গর্ব বা দম্ভ করে, মনুষ্যত্বের বিচারে সে অতি হীন, অতি ক্ষুদ্র। মনে রাখতে হবে, মানুষের কর্মফলই সব, কর্মফলই ঠিক করে, কে ছোট কে বড়। কর্মফলই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

শাস্তা থামেন ক্ষণকাল। ধর্মসভা এত নিস্তব্ধ যে, একটা সুচ পড়লেও বোধহয় শব্দ শোনা যায়।

আবার কানে আসে শাস্তার কণ্ঠস্বর, জীবকের কাছে মনে হয় দৈববাণীর মতো। শাস্তা বলেন,—মহত্তম কর্মফল লাভ করতে হলে মানুষকে পালন করতে হবে পঞ্চশীল অর্থাৎ পরিহার করতে হবে অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ, চৌর্য ও জীবহিংসা। এই পঞ্চশীল যারা পালন করে, সর্বজীবে যাদের সমান মমতা এবং অহিংসাকেই যারা জীবনের পরম ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে, মানুষের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, সুশীল ও বরণীয়—জাতি, বর্ণ ও জন্মের মিথ্যা অহমিকায় যারা মগ্ন, তারা নয়। পঞ্চশীল পালনের মধ্য দিয়ে যারা জীবনের কর্ম করে যায়, তারাই শেষ পর্যন্ত লাভ করে মুক্তি।

জীবক অভিভূত। বুদ্ধের অপূর্ব দ্যুতিময় করুণাঘন মূর্তি ও তাঁর বাণী তার অর্ন্তজগতে তখন তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সহজ যুক্তি, উপমা ও উপখ্যানের মধ্য দিয়ে মহামহিম মানুষটি সুমধুর কণ্ঠে যে উপদেশ দিয়ে চলেছেন, তা শুনতে-শুনতে অব্যক্ত কী এক আনন্দের অনুভূতিতে জীবকের অন্তর ভরে উঠেছে। মানব-জীবনের সার্থকতা ও শান্তির পথ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার চোখের সামনে।

ধর্মসভা শেষ হয় একসময়। গভীর ভক্তিতে জীবক গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল পরমগুরুকে। তারপর তিনটি পদ্মের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ ওষুধ রেখে তাঁকে দিলে আঘ্রাণ নেওয়ার জন্য। দ্বিতীয়বার আর ওষুধ দেওয়ার দরকার হয় না। বুদ্ধদেব সুস্থ হন।

পরদিনই জীবক আবার গিয়ে হাজির হয় বেণুবনে। শুধু সেদিনই নয়, তার পর থেকে প্রতিদিনই কী এক আকর্ষণ যেন জীবককে টেনে নিয়ে যায় শাস্তা তথাগতের চরণতলে। যত দিন যায়, আকর্ষণ ততই দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

তথাগতের স্নেহসিঞ্চনে মন তার তত দিনে অনেকটা শান্ত হয়েছে। তথাগতের সেই উপদেশ জীবকের কানে বাজে সর্বক্ষণ,—বিমর্ষ কেন, জীবক? আমি জানি, কোথায় তোমার ব্যথা। কিন্তু মনে রেখ, সত্য চিরদিন চাপা থাকে না, একদিন তা সূর্যের মতো প্রতিভাত হবেই। নিজের মনকে শক্ত করো। পুরোনো সমাজের অন্যায়, অবিচার, রীতিনীতি ও কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করার মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করো। ভুলে যেও না, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, অচিরবতী প্রভৃতি মহানদীগুলি যেমন সমুদ্রে পড়ে নিজ-নিজ নাম হারায়, তেমনি যারা আমার শিক্ষা ও নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলে, এই শ্রমণ-সঙ্ঘের দৃষ্টিতে তাদেরও আর কোনও জন্মগত বা জাতিগত পার্থক্য থাকে না।

জীবক বড় খুশি হয়, যখন দেখে, পিতা অভয়ও বুদ্ধের শরণাগত।

॥ ছয় ॥

জীবকের দিন কাটছে মন্দ নয় ঃ সারাদিন কাজ আর সন্ধ্যার পর বেণুবন বিহারে গমন। বুদ্ধের শরণ নেওয়ার পর থেকে নিজের জন্ম-রহস্য জীবককে আর ততখানি বিচলিত করে না। নিতান্ত বাধ্য না হলে নাগরিক জীবনের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান সে সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলে।

এমনি করে দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে যখন শান্ত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে জীবকের জীবন-ধারা, তখন ঘটল সেই অঘটন, যা তার জীবনে আনল দূরপ্রসারী পরিবর্তন, জীবনের মূল ধরে টান মারল গভীরভাবে।

মহারাজ বিম্বিসার সেদিন তাকে ডেকে পাঠালেন নিজের বিশ্রামকক্ষে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ জিগ্যেস করলেন,—আচ্ছা, জীবক, তোমার

কোনও ঘোরতর শত্রু যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি কী করবে?

প্রশ্ন শুনে জীবক অবাক হয়। সহজ কণ্ঠে বিনীতভাবে বলে,—এ প্রশ্ন কেন করছেন মহারাজ, জানি না। আমি চিকিৎসক, মানুষের সেবাকেই জীবনের পরম ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি। সেখানে শত্রু-মিত্র, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্রের কোনও পার্থক্য নেই।

হেসে বিম্বিসার বললেন,—আমি তা জানি। তবু বড় সুখী হলাম তোমার মুখ থেকে শুনে। এবার তাহলে শোনো। তোমার এককালের সতীর্থ যশঃপাণির পুত্র গুপ্তিলকে নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমার সঙ্গে তার ব্যবহার ভুলবার নয়। কিছুকাল যাবৎ গুপ্তিল গুরুতর অসুস্থ—বলতে গেলে মরণাপন্ন। কোথায় কার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে পেটে দারুণ আঘাত খেয়েছিল, তারপর থেকে এই অবস্থা। যশঃপাণির একমাত্র ছেলে গুপ্তিল, আর এক মেয়ে। ছেলের কোনও চিকিৎসাই যশঃপাণি বাকি রাখেনি। এখন তার এবং তার স্ত্রী ও মেয়ের একান্ত ইচ্ছা, তুমি গুপ্তিলের চিকিৎসার ভার নাও। সোজা তোমার কাছে যেতে তাদের সাহস হয়নি। তাই আমায় ধরেছে। আমারও ইচ্ছা জীবক, তুমি গুপ্তিলের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য, মহারাজ।

পাশের ঘরে যশঃপাণি দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছেন। বিম্বিসার সংবাদ পাঠাতেই, এসে ঘরে ঢুকলেন। গুপ্তিলের চিকিৎসায় জীবক সম্মত আছে শুনে দু-হাত দিয়ে তিনি চেপে ধরলেন জীবকের ডান হাতখানা। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে, আবেগে হাত দুখানা কাঁপছে থরথর করে।

মৃদু কণ্ঠে জীবক বললে,—আপনি শান্ত হোন। এখানে আমি চিকিৎসক, গুপ্তিল রোগী, শত্রু-মিত্রের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া কৈশোরের সে ঘটনায় আমার লাভ বই ক্ষতি তো হয়নি, তা যে মন নিয়েই গুপ্তিল তা করে থাক না কেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, সে রোগী আর আমি চিকিৎসক।

জীবককে নিয়ে যশঃপাণি বাড়ি গেলেন। দোর গোড়ায় তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন। জীবককে তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন ওপরে। তাকে বসিয়ে বললেন,—গুপ্তিল এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছে, বাবা। চোখে ওর ঘুম নেই। ওকে কি এখুনি দেখতে চাও?

না,—জীবক বলে,—আমি অপেক্ষা করছি। ততক্ষণে ওর রোগের ইতিহাসটা আমায় বলুন।

জীবক বুঝি চোখ ফেরাতে পারে না। জানলার ধারে
একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে..তাকিয়ে আছে তার দিকে।

অতঃপর গুপ্তিলের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলে তিনজনের মধ্যে। একসময় যশঃপাণি বললেন,—আচ্ছা, শর্মিষ্ঠা গেল কোথায়? জীবককে দিয়ে চিকিৎসা করানোয় যার উৎসাহ ও আগ্রহ সবচেয়ে বেশি, তারই এখন দেখা নেই। আশ্চর্য মেয়ে বটে।

যশঃপাণির স্ত্রী বললেন,—সত্যি, ওর কথাই কিন্তু ঠিক হল। বুঝলে বাবা, তোমার কাছে যাওয়ার প্রশ্নে আমাদের দ্বিধা-সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু ওর ছিল না। সেদিন বিরক্ত হয়ে আমি ওকে বলেছিলাম, তুই কী করে জানলি যে জীবক আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে না? তুই কী ওকে চিনিস নাকি যে, অত জোর দিয়ে বলছিস? তার উত্তরে ও কী বলেছিল, জানো? বলেছিল, তাঁকে আমি যতবার দেখেছি আর তাঁর সম্বন্ধে যা সব শুনেছি, তা থেকে আমার মন বলছে, এ জাতীয় ক্ষুদ্রতা তাঁর মধ্যে নেই, অনুরোধ করলেই দাদার চিকিৎসার ভার তিনি নেবেন। সত্যি, মেয়ের বুদ্ধি আছে বটে!

নতচোখে জীবক মৃদু হাসল।

ওরা যে ঘরে বসে আছে, তার পাশেই এক একখানা ঘর। দু-ঘরের মাঝে একটা জানলা। তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন যশঃপাণি ও তাঁর স্ত্রী।

কথা বলতে-বলতে একসময় জানালার দিকে চোখ পড়ে জীবকের। ভীষণ চমকে উঠল সে,—সে কী! কে ও? এ কী অপরূপা! দেবলোকের অপ্সরা নাকি!

জীবক বুঝি চোখ ফেরাতে পারে না। জানলার ধারে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার চোখে চোখ পড়তেই তরুণীর মুখে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ে। বিজলীপ্রভার মতো ক্ষণিকের হাসির ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। পরক্ষণে জানলা থেকে সরে যায় সে।

আর স্থাণুর মতো বসে থাকে জীবক—সম্মোহিত যেন। মন উত্তাল। এ কী দেখল সে! পৃথিবীর মাটিতে কী সম্ভব এমন রূপ! এ লাবণ্য, এ সোনার বরণ রূপ-সুষমা—এ যে স্বপ্নজগতের, রূপকথারাজ্যের! এ কী সত্যি! না, তার চোখে কেউ মায়াজাল পরিয়ে দিয়েছে—সে জেগে স্বপ্ন দেখছে!

হঠাৎ তার কানে এল এক আশ্চর্য মধুর কণ্ঠ,—বাবা, আমার খোঁজ করছিলেন?

কে? শর্মিষ্ঠা?—যশঃপাণি বললেন,—এসো মা, বৈদ্যরাজ জীবক এসেছেন, গুপ্তিলের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

শর্মিষ্ঠার নত চোখ। আরক্তিম মুখে হাসির আবার সেই বিদ্যুৎঝিলিক। ধীর মন্থর পদে এসে সে প্রণাম করে জীবককে। তার দীর্ঘ আলুলায়িত মেঘবরণ কেশরাশি লুটিয়ে পড়ে জীবকের পায়ের ওপর।

জীবক কথা বলতে পারে না—যেন বাহ্যজ্ঞানহারা। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত। বাস্তব জগতের কোনও শব্দই বুঝি তার কানে ঢুকছে না, অন্য কোনও দৃশ্যই বুঝি তার চোখে নেই।

এমন সময় সংবাদ এল, গুপ্তিল জেগে গেছে, মাকে ডাকছে।

মা বললেন, চলো বাবা, গুপ্তিলকে দেখবে।

জীবকের যেন সংবিৎ ফিরে আসে, সজাগ হয়ে ওঠে ভেতরের চিকিৎসক সত্তা।

জীবককে দেখে গুপ্তিল দারুণ চমকে যায়। শরীর তার অতি শীর্ণ। চোখ বড়-বড় করে সে তাকিয়ে থাকে জীবকের দিকে। চোখে করুণ অসহায় দৃষ্টি।

জীবক বুঝতে পারে গুপ্তিলের মানসিক অবস্থা। গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে সে বললে,—বিচলিত হয়ো না, ভাই। তুমি নিশ্চয়ই সুস্থ হবে। অতীতের সেসব তুচ্ছ ঘটনা ভুলে যাও।

গুপ্তিলের দু-চোখে নামে নীরব অশ্রুধারা। সে অশ্রু বোধহয় শুধু গভীর কৃতজ্ঞতার নয়, বুঝি হৃদয় নিংড়ানো অনুতাপেরও।

গুপ্তিলের রোগের আনুপূর্বিক ইতিহাস জীবক আগেই শুনেছে। এবার সে তাকে পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ ধরে। শেষে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যশঃপাণি ও তাঁর স্ত্রীকে বলল,—গুপ্তিলের পেটে অস্ত্রোপচার করতে হবে। মনে হয়, ওর অন্ত্রে গুরুতর কিছু ঘটেছে। ভেষজ-চিকিৎসায় তা নিরাময় হওয়ার নয়।

অ্যাঁ, অস্ত্রোপচার!—গুপ্তিলের মায়ের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে আর্তস্বর।

হ্যাঁ।—কিন্তু আপনারা ভয় পাবেন না। গুপ্তিল নিশ্চয়ই নিরাময় হবে। —বলতে-বলতে জীবকের চোখ পড়ে শর্মিষ্ঠার ওপর। যশঃপাণির পাশে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। বিবর্ণ মুখ যশঃপাণির—পাষাণের মূর্তি যেন। আর শর্মিষ্ঠা? জলভরা মেঘের মতো ব্যথায় ও বিষাদে থমথম করছে তার সারা মুখ। আয়ত দুই মৃগনয়নে নিরুপায় করুণ আকুতি। বস্ত্রাঞ্চল কামড়ে ধরে মনের আবেগ রোধ করছে সে।

জীবক আবার বুঝি হারিয়ে ফেলে নিজেকে। স্থান কাল বিবেচনার শক্তিও যেন তার লোপ পাওয়ার মতো। মুগ্ধ দৃষ্টি সে ফেরাতে পারে না সেই স্বর্ণ-প্রতিমার ওপর থেকে।

ক্ষণপরেই সজাগ হয়ে ওঠে সে। আত্মসংবরণ করে গুপ্তিলের বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

পরদিন গুপ্তিলের পেটে অস্ত্রোপচার হল। দেখা গেল, পেটের ভেতরে অন্ত্র জড়িয়ে গেছে, যার ফলে কোনও আহার্যই সে গ্রহণ করতে পারছে না।

অস্ত্রোপচার শেষে জীবক বললে,—আর ভয় নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই ও সুস্থ হবে।

তা-ই হল। দিন দশেকের মধ্যেই সুস্থ হয় গুপ্তিল। আর সেই সঙ্গে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় তার মধ্যে। জীবকের মহত্ত্ব ও আদর্শের ছোঁয়ায় তার মনের আবিলতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সে উজাড় করে দিয়েছে জীবককে। যখন-তখন সে ছুটে যায় জীবকের কাছে। এ আকর্ষণ সে রোধ করতে পারে না। রোধ করার চেষ্টাও করে না।

আর জীবক! জীবকের মনের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। মনে চলেছে তুমুল ঝড়। মাথায় চিন্তা আর চিন্তা—সারা অন্তর জুড়ে আছে শুধু শর্মিষ্ঠার ভাবনা। কোনও কাজ সে করতে পারে না, কোনও কাজে মন বসাতে পারে না—একমাত্র রোগীর চিকিৎসা ছাড়া। তা-ও যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বেণুবনে বুদ্ধসকাশে যাওয়াও আর নিয়মিত নয়। সেখানে গিয়েও সে চুপচাপ বসে থাকে—কথা বলে না। তথাগতের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির ভয়ে সে সন্ত্রস্ত।

॥ সাত ॥

যত দিন যাচ্ছে, জীবকের অস্থিরতা ততই বেড়ে চলেছে। শর্মিষ্ঠার মনের খবরও সে পেয়েছে কয়েক দিন হল। পেয়েছে শর্মিষ্ঠার এক সখীর মাধ্যমে।

সে ও শর্মিষ্ঠা, দুজনেই চায় দুজনকে আপন করে পেতে, বিয়ে করতে।

কিন্তু তা তো কখনই সম্ভব নয়! সে রাজবৈদ্যই হোক আর যত কীর্তিমানই হোক, জন্ম যার রহস্যাবৃত, অজ্ঞাত যার মা-বাবার পরিচয়, তার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিয়ের প্রস্তাব যশঃপাণি ও গুপ্তিলের কাছে কে করবে? তার

প্রভৃতি যত কৃতজ্ঞতাই ওদের থাক, গুপ্তিল আজ যত বড় বন্ধুই হোক, এ প্রস্তাব তাদের কাছে উন্মাদের কাণ্ড বলেই গণ্য হবে। সুতরাং অসম্ভব এ কল্পনা—কোনওদিনই বাস্তবে রূপ পাওয়ার নয়।

তাহলে? তাহলে কী হবে?—জীবক বিপর্যস্ত। দিনে তার স্বস্তি নেই, রাতে ঘুম নেই।

নিরুপায়! নিরুপায়! আশার ক্ষীণ রেখাও নেই কোথাও। কী করবে সে? তাহলে কী সবকিছু পেছনে ফেলে রাজগৃহ ত্যাগ করে চলে যাবে চিরকালের মতো? দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তার পক্ষে তো আর রাজগৃহে বাস করা সম্ভব নয়! ব্যর্থ জীবনের এই জ্বালা নিয়ে কোথায় সে যাবে জানে না, তবে দূরে বহুদূরে কোথাও।

জীবকের এই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা কিন্তু অভয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। নিদারুণ দুশ্চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি,—কী হল? আবার কী হল?

এমনিতেই শালবতীকে নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার সীমা নেই। শালবতীর স্বাস্থ্যের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে যে কোনওদিন বিপদ ঘটতে পারে। অথচ শালবতী সেদিকে নির্বিকার।

জীবক ফিরে এলে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন দুটি কারণে ঃ এক, সুদীর্ঘ কাল পরে পুত্রকে আবার কাছে পেলেন। দুই, পুত্র তাঁর মর্তের ধন্বন্তরি, তাকে দিয়ে তিনি শালবতীর চিকিৎসা করাবেন।

কিন্তু এ প্রস্তাবে শালবতী কিছুতেই রাজি হননি। এবং শত অনুরোধেও আপত্তির যুক্তিসঙ্গত কারণও কিছু দেখাননি। বিষম পীড়াপীড়ির ফলে একদিন শুধু বলেছিলেন,—কুমার, কেন অকারণে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন? নিয়তিকে মেনে নিন। আপনার পুত্র মর্তের ধন্বন্তরি, খ্যাতি তার বিশ্বব্যাপী। আমার চিকিৎসার ভার তাকে দিয়ে কেন তার ওই খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করবেন? আমার এ রোগ সে কখনই নিরাময় করতে পারবে না—এ রোগ ধন্বন্তরিরও অসাধ্য।

ব্যস ওই পর্যন্ত। ও সম্বন্ধে আর কোনও কথা তাঁর মুখ থেকে আর কোনওদিনই বের করা যায়নি।

শালবতীকে নিয়ে এই যখন অভয়ের মনের অবস্থা, তখন জীবকের অস্থিরতা তাঁকে অকূল পাথারে ফেলল।

তিনি গোপনে অনুসন্ধান শুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত যখন জানতে পারলেন সবকিছু, তখন মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। যশঃপাণির কাছে

জীবকের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিবাহের প্রস্তাব করা যে বাতুলতা, তা তাঁর চেয়ে কে বেশি জানে! এখন উপায়?

অভয় উদ্বেগে ছটফট করতে থাকেন। পথ খোঁজেন অন্ধকারে। কিন্তু কোনও সমাধানই চোখে পড়ে না।

এমনসময় জীবক একদিন এসে জানাল, শীঘ্রই দু-চার দিনের মধ্যে সে রাজগৃহ ত্যাগ করে যাচ্ছে চিরতরে।

অভয় ভয়ানক চমকে উঠলেন,—রাজগৃহ ছেড়ে যাবি! চিরকালের জন্য! কোথায় যাবি?

—তা জানিনে। ঠিক নেই কিছু।

জীবকের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে অভয় আর কোনও কথাই বলতে পারলেন না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নিশ্চল পাষাণমূর্তির মতো। যখন হুঁশ হল, দেখলেন জীবক বেরিয়ে গেছে।

অন্তরে ক্ষতবিক্ষত অভয়—দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীর অবসন্ন পদে চললেন শালবতীর কাছে...

শালবতীর কক্ষ। অভয় ও শালবতী বসে আছেন। দুজনেই নির্বাক ও গভীর চিন্তামগ্ন। অভয়ের কাছে শালবতী সবই শুনেছেন।

শেষে এক সময় শালবতীর বুঝি চমক ভাঙল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে-ধীরে তিনি বললেন,—দেব, জীবক রাজগৃহ ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে নেবে ভাবিনি। তাই আপনাকে বলিনি কিছু। আপনি জানেন না, জীবকের জন্মরহস্য উদঘাটনের পরিকল্পনা আমার বহু কালের। আর সেজন্য চেষ্টাও করে চলেছি। রহস্যের সমাধানও প্রায় শেষ, আগামী—

বলছ কী, শালবতী?—বিস্ময়ে আনন্দে অভয় ফেটে পড়েন, জীবকের জন্মরহস্য নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ! তার সমাধানও করেছ?

ম্লান হেসে শালবতী বললেন,—হ্যাঁ, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতদিন আপনাকে বলিনি। ভেবেছি, রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলেই সব জানতে পারবেন। যাই হোক, জীবককে গিয়ে বলুন, আজ থেকে সপ্তম দিবসে সে নিজের জন্ম-পরিচয় জানতে পারবে, জানবে কারা তার বাবা-মা।

আনন্দে উত্তেজনায় অভয় স্বভাবতই স্থির থাকতে পারছেন না। কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, শালবতী বাধা দিলেন,—শুনুন কুমার, দয়া করে আজ

আর কোনও প্রশ্ন করবেন না। নির্ধারিত দিনে ছাড়া কোনও কিছু প্রকাশ না করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুধু শুনে রাখুন, অত্যন্ত উচ্চ বংশে জীবকের জন্ম। হ্যাঁ, আর একটা কথা। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির হয়েছে, জীবকের বাবা-মা ওইদিন আমার বাড়িতেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে শালবতী আবার বললেন, —আপনার উত্তেজনা ও কৌতূহল বুঝতে পারছি। কিন্তু আজ আমি নিরুপায়। এজন্য আমায় মার্জনা করবেন। ওইদিন যাঁরা-যাঁরা এ বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের মধ্যে আপনি ও জীবক ছাড়াও মহারাজ বিম্বিসার, যশঃপাণি, গুপ্তিল, শর্মিষ্ঠা, অশ্বক এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য নাগরিক থাকবেন। জীবকের বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে আমিই অবশ্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করব।

॥ আট ॥

নির্দিষ্ট দিন। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শালবতীর প্রাসাদের দ্বিতলে সবচেয়ে বড় প্রশস্ত কক্ষে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। কক্ষটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা। অভ্যাগতদের জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কক্ষের দক্ষিণ অংশে। বাকি অংশ ফাঁকা।

সুসজ্জিত কক্ষের দুধারে স্ফটিকের ঝাড়-বাতিদানে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু ফাঁকা উত্তরাংশে আলো বেশ কম।

অভ্যাগতদের মধ্যে কারও আর আসতে বাকি নেই। মহারাজ বিম্বিসার, অভয়, জীবক, যশঃপাণি, গুপ্তিল, শর্মিষ্ঠা, অশ্বক প্রভৃতি সবাই উপস্থিত। অভয় ও জীবক বাদে অন্যদের কাছে শালবতীর যে আমন্ত্রণলিপি গিয়েছিল, তাতে আমন্ত্রণের দুটি কারণ বলা হয়েছে ঃ এক, বৈদ্যরাজ জীবকের জন্মরহস্যের আবরণ উন্মোচন; দুই, শালবতীর ব্রতভঙ্গ।

জীবকের জন্মরহস্য জানতে অন্যেরা সবাই উদ্‌গ্রীব সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবক এসে দাঁড়িয়েছে ধৈর্যের শেষ সীমায়।

তার জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্য দুঃখবেদনার মূলে যে রহস্য, এতকাল পরে হঠাৎ তাব যবনিকা উত্তোলনের সূত্র পাওয়া গেছে, এতকাল পরে আবার সে নতুন করে জন্ম নেবে এবং বাবা-মার সঙ্গে শর্মিষ্ঠাকে পাশে নিয়ে বিশ্বের বুকে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলবে, মর্তের ধন্বন্তরি আমি বিশ্বের বিস্ময়! আঃ! ভাবতেও কত সুখ, কী আনন্দ!—এমনি সব চিন্তা

ও কল্পনা গত সাতদিন ধরে তাকে যেন পাগল করে তুলেছে। সাতটা দিনের অধীর প্রতীক্ষা তার কাছে মনে হয়েছে যেন সুদীর্ঘ সাত বছর। আর এখন প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে যেন এক-একটি ঘণ্টা।

জীবকের পরেই এ রহস্য উদঘাটনে যাঁদের ব্যগ্রতা সর্বাধিক, তাঁরা হচ্ছেন অভয় ও শর্মিষ্ঠা।

অবশ্য যশঃপাণি ও গুপ্তিলের আগ্রহও কম নয়। কয়েক দিন হল, সমস্ত ব্যাপারটা তাঁরা জেনেছেন। জীবকের মতো পাত্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি মিলবে না, সে বিষয়ে তাঁদের দ্বিমত নেই। কিন্তু সে যে অজ্ঞাতকুলশীল, তার জন্ম-পরিচয় রহস্যাবৃত। আজ সেই রহস্য উন্মোচিত হবে,—তাই তাঁদের আগ্রহ স্বাভাবিক।

হঠাৎ কক্ষের উত্তর দিকের দরজা খুলে গেল, আর সবাই সবিস্ময়ে দেখল, কক্ষে প্রবেশ করছে সর্বাঙ্গ শুভ্রবসনে ঢাকা এক মনুষ্যমূর্তি। তার এক হাতে এক প্রদীপ।

দরজার পাশে দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গির নিচে উঁচু একটি ছোট রৌপ্যাধার। মূর্তি এগিয়ে এসে কুলুঙ্গির মধ্যে প্রদীপটি রাখল। তারপর বসনের ভেতর থেকে বের করল কী এক জিনিস, দূর থেকে দেখে ভূর্জপত্র বলেন মনে হয়। ওটা সে রাখল চৌকির ওপর।

জীবক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে---যেন বাহ্যজ্ঞানরহিত। বিস্ময় ও উত্তেজনা তার চরমে পৌঁছেছে। সেই দৃশ্য! সেই ছায়ামূর্তি! প্রায় এগার বছর আগে কৈশোরে সেই গভীর রাতে আমবাগানে যে দৃশ্য সে দেখছিল, সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি!

হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে জীবক ছুটল ছায়ামূর্তি লক্ষ করে। মূর্তিটি টলছে, বোধহয় এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ছুটে গিয়ে সে মূর্তিটাকে বাঁ-হাতে জাপটে ধরল, আর ডান হাতে তুলে নিলে ভূর্জপত্রখানি।

শুভ্র ভূর্জপত্রের ওপর ছোট-ছোট রক্তাক্ষর। সেই একই হস্তাক্ষর, জীবকের মনের পটে যা অক্ষয় হয়ে আছে।

জীবক দ্রুত পড়ে যায় লেখাটা ঃ

জীবক, বাবা আমার!

আমি শালবতী তোর মা; রাজকুমার অভয় তোর বাবা। তাঁর সঙ্গে গোপনে আমার বিয়ে হয়েছিল। বিবাহ করা ও সন্তান হওয়া রাজনর্তকীর পক্ষে গুরুতর দণ্ডনীয়

অস্থিরভাবে সে মায়ের বুক পরীক্ষা করছে, হৃৎস্পন্দন শোনার
চেষ্টা করছে, নাড়ি দেখছে, পরীক্ষা করছে চোখের ভেতরটা।

অপরাধ। তাই তোর জন্ম আমাকে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হয়েছিল, তোর বাবাও জানতেন না। তাঁর আমবাগানে আমিই তোকে রেখে আসি। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত তোকে আমি সবসময় চোখে-চোখে রেখেছি, কখনই ধরাছোঁয়ার বাইরে যেতে দেইনি। মাত্র একবার, সেই কৈশোরে যখন তুই গৃহ ত্যাগ করেছিলি, তখনই শুধু বুঝতে পারিনি তুই কোথায় গেছিস—বারাণসী, না তক্ষশিলায়। তক্ষশিলাতেও আমার লোক ছিল। তোর সংবাদ পেয়েছি নিয়মিত। তোর সবকিছুই আমি জানি। কিন্তু কেউ জানে না, কীভাবে তিলে-তিলে আমি দগ্ধ হয়েছি, ক্ষয় হয়েছি। প্রার্থনা করি, আমার মতো দুর্ভাগ্য যেন কারও না হয়। আশীর্বাদ করি বাবা, শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে তুমি জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করো। আরও অনেক বড় হবে তুমি। স্থাপন করবে আরও অনেক মহত্তর উজ্জ্বলতর কীর্তি। তোমার পিতার দিকে একটু লক্ষ রেখো, বাবা। তিনিও বড় দুর্ভাগা। ইতি—

তোর অভাগিনী মা
শালবতী

পত্রখানা পড়তে-পড়তে অভূতপূর্ব আনন্দের বন্যায় জীবকের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, তার চেতনা বুঝি ধীরে-ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে, অবশ হয়ে আসছে দেহ-মন-চিন্তাশক্তি। তার মা শালবতী, বাবা অভয়!—বারবার অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে কথাটা। কিন্তু শেষের লাইন কটি পড়তেই কেঁদে ফেললে সে।

এতক্ষণে তার খেয়াল হল, কাঁধের ওপর বসনে ঢাকা যিনি এলিয়ে আছেন, তিনি কে? মা? কিন্তু এ কী! দেহ যে নিস্পন্দ! সঙ্গে-সঙ্গে দেহটি কোলে নিয়ে সে বসে পড়ল মেঝের গালিচার ওপর তাঁর মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলতেই চমকে উঠল সে,—অ্যাঁ, তাই তো! মা-ই তো!

স্তম্ভিত হতভম্ব সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই কেঁদে উঠল আকুল কণ্ঠে, —মা! মা! মাগো—

অন্যেরা আগেই ছুটে এসেছে। সবারই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। গুপ্তিল এসে দাঁড়িয়েছে প্রাণদাতা বন্ধুর পেছনে। তার দু-চোখে অশ্রু টলোমলো। অভয়

কাঁপতে-কাঁপতে দেয়াল ধরে কোনওমতে টাল সামলে বসে পড়েছেন মেঝের ওপর। অদূরে চোখে আঁচল দিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শর্মিষ্ঠা।

আর জীবক! চোখে তার অশ্রুর বন্যা। অস্থিরভাবে সে মায়ের বুক পরীক্ষা করছে, হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করছে, নাড়ি দেখছে, পরীক্ষা করছে চোখের ভেতরটা।

হঠাৎ সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল,—হতে পারে না! এ হতে পারে না! আমি জীবক—মর্তের আমি নাকি ধন্বন্তরি! আমার মাকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যেতে দেব না, দেব না, দেব না—

মহারাজ বিম্বিসার ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখেন। যশঃপাণি বসে পড়েন অভয়ের পাশে।